



বৌদ্ধধর্ম



রৌদ্রময়ীদের পক্ষ থেকে
'রৌদ্রময়ীদের'

সূচি

১। রৌদ্রময়ীদের কথা.....	৬
২। সত্য রূপকথা	
বিনতে আব্দুল্লাহ.....	৮
৩। থার্টিফাস্টনামা	
হলি সুরভী.....	১৪
৪। দশ মিনিট	
সিহিন্তা শরীফা.....	১৯
৫। উপহার	
রেহনুমা বিনত আনিস.....	২৩
৬। লাল সোয়েটার	
বিনতে আব্দুল্লাহ.....	৩০
৭। ভালোবাসা	
বিনতে আব্দুল্লাহ.....	৩৩
৮। অপরাজিতা	
হলি সুরভী.....	৩৮
৯। টেম্পার ট্যান্ড্রাম	
সিহিন্তা শরীফা	৪২
১০। পাওয়া না-পাওয়ার গল্প	
হাসনীন চৌধুরী.....	৪৭
১১। লজ্জা	
আনিকা তুবা.....	৫১
১২। পহেলা বসন্ত	
নূরুন আলা নূর.....	৫৩

১৩। লাভস্টোরি	
উন্মে মারঈয়াম.....	৫৭
১৪। বাবু তাতো ছোট	
সাকিবা আহমেদ.....	৬১
১৫। মূল্যায়ন	
রেহনুমা বিনতে আনিস.....	৬৫
১৬। সাবরুন জামীল	
নিশাত তামমিম.....	৭০
১৭। আল মুমিনের দাসী	
নূরুন আলা নূর.....	৭৩
১৮। সুখি দাম্পত্য	
বিন্তে আনসারী.....	৭৭
১৯। পাত্রী চাই	
সাকিবা আহমেদ.....	৭৯
২০। ফরয হয়ে যায়নি তো?	
ফাহিমদা হুসনে জাহান.....	৮২
২১। ফিরে আয় প্লিজ!	
সিহিন্তা শরীফা.....	৮৬
২২। আঁধার আলো	
আনিকা তুবা.....	৯০
২৩। স্বপ্নপুরুষ	
বিনতে হক.....	১০৪
২৪। পুনরাবৃত্তি	
উন্মু আসাদুল্লাহ.....	১১০
২৫। ধমুকজ ম্যাট্রিমনি	
আফিফা আবেদীন সাওদা.....	১১২

২৬। হিজাব কি আমার চয়েস?

উন্ন মারঈয়াম..... ১২০

২৭। লাভস্কেল

উম্মে লিলি..... ১২৩

২৮। পরিত্যক্ত ডায়রী

নুসরাত জাহান মুন.....১২৭

রৌদ্রময়ীদের কথা

সব সময় বলা হয়, সাহিত্য সমাজের দর্পণস্বরূপ। কিন্তু এর বিপরীত চিত্রটিও সমান সত্য যে, সাহিত্য সব সময় সমাজকে শুধু প্রতিনিধিত্বই করে না, সমান্তরালভাবে পাঠকদের মানসিক বিকাশে সূক্ষ্ম কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ লেখনীর এমন শক্তি রয়েছে যে, ছাপার অক্ষরের মাধ্যমে একটি পুরো প্রজন্মের মানসিকতার আমূল পরিবর্তন সাধন করা যায়। সেই সাথে পরিচ্ছন্ন ও সত্যাত্মক অন্তর গঠনকল্পে উজ্জীবিতও করা যায়।

আমাদের রৌদ্রময়ীদের লক্ষ্য অনেকটা এমনই। পরিচ্ছন্ন অনলীলতাবিহীন সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে বাঙালি পাঠকদের বিনোদনপ্রদানের সাথে সাথে সুন্দর কোন মেসেজ পৌঁছে দিতে সদাই তৎপর আমরা। সেই লক্ষ্যেই ফেসবুকে রৌদ্রময়ী নামের পেজের মাধ্যমে আমাদের সুস্থ সাহিত্যচর্চার পথচলা শুরু। আশা করি আমাদের লেখাগুলো শুধু সাময়িক সুখপাঠ্য হওয়ার ভেতরেই সীমাবদ্ধ না থেকে, পাঠকের ভাবনার জগৎকে নাড়া দিতে সক্ষম হবে। এখন অনেকের প্রশ্ন হতে পারে, এই রৌদ্রময়ী কারা? রৌদ্রময়ী হচ্ছেন সেই নারীরা, যারা তাদের লেখার মাধ্যমে ইতিবাচক মানসিকতার আলো ছড়িয়ে দেন। যেখানে থাকে না স্বাধীনতার নামে স্বৈচ্ছাচারী জীবনের দিকে আহ্বান; বরং তাদের লেখায় আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার বিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সামগ্রিক জীবনযাত্রা ও সামাজিক সম্পর্কগুলোর প্রতি দায়িত্বশীলতা প্রকাশ পায়।

রৌদ্রময়ীদের পক্ষ থেকে

হাসনীন চৌধুরী

সিহিন্তা শরীফা

নূরুন আন নূর

একটি বিশেষ ঘোষণা

এই বইটির সমস্ত কনটেন্ট ইন্টারনেট ও রৌদ্রময়ী এর ফেসবুক গ্রুপ/পেজ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বইটি সরাসরি কনটেন্ট গুলো কাট/কপি করা হয়েছে।

ইন্টারনেট থেকে আমরা শুধুমাত্র সংগ্রহ করে একত্রে সাজিয়েছি মাত্র।

প্রকাশকের কোন প্রকার ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

তাই কাগজের বই এর কোন বিকল্প নেই।

সত্য রূপকথা

বিনতে আব্দুল্লাহ

সদ্য শেষ করা বইটা বন্ধ করে এক দীর্ঘশ্বাস ফেললো রাদিয়া।
রাসুল (সাঃ) এর কন্যা ফাতিমাকে নিয়ে লেখা বই।
ইদানীং কেন যেন বইয়ের পোকা রাদিয়াকে উপন্যাস আর টানে না।
বরং আদর্শ মানুষদের জীবনী পড়তে যেন বেশি ভালো লাগে।

"এতো ভালো মানুষ হয়!"

মনে মনে ভাবলো সে। "এতো কষ্টের ভিতর কি করে ধৈর্য রাখতেন? সন্তানদেরই বা
কি করে লালন পালন করতেন?"

ভাবতে না ভাবতেই তার নিজের সন্তান মারিয়া এসে হাজির হল।
অনেক কষ্টে সোফার উপর উঠে মায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললো, "আম্মু, আজকে
রাতে গল্প শুনাবে না?"

তাইতো !

অনেক রাত হয়ে গেছে বই পড়তে পড়তে, এদিকে গল্পের পোকা তার পাঁচ বছর বয়সী
মেয়ে অস্থির হয়ে আছে।

গল্প না শুনে সে ঘুমাবে না।

তাও ভালো পরদিন শুক্রবার।

- "হ্যা আম্মু শুনাবো।"

- "কোন প্রিন্সেস এর গল্প?"

হাতের বইটার দিকে তাকালো একবার রাদিয়া।

তারপর একপাশে রাখতে রাখতে বললো, "আজকে শোনাবো অন্য রকম এক প্রিন্সেস
এর গল্প।

প্রিন্সেস ফাতিমার গল্প।"

রূপকথা পাগল মেয়ে প্রিন্সেস ছাড়া কোন কাহিনীই শুনবেই না।

অদ্ভুত স্বভাব।

তাই প্রিন্সেস শব্দটার আশ্রয় নিতে হল রাদিয়াকে।

তবে গল্প নয়, সত্যিকার কাহিনী বলতে চায় সে- ফাতিমা (রাঃ) এর আসল জীবনী।

মেয়েকে মুখামুখি বসিয়ে বলা শুরু করলো রাদিয়া।

ফাতিমা (রাঃ) এর জীবনের অনেক গুলো ঘটনা এক এক করে বর্ণনা করে গেল।

কি করে বিলাস বিহীন জীবন যাপন করতেন, সেসব ও বললো।

বলতে বলতে এক পর্যায়ে এসে সে থেমে গেলো, এখন মৃত্যুর ঘটনা ছাড়া তো আর কিছু তার জানা নাই।

- "তো, আম্মু। কেমন লাগলো কাহিনী?"
- "কাহিনী শেষ?"
- "হ্যাঁ।"
- "কিন্তু... কিন্তু... ওর প্যালেস কই? হ্যাপি এন্ডিং কই?"
- "এই প্রিন্সেস এর প্যালেস নাই, মা। তবে সে হ্যাপি ছিলো।"
- "উহু। এত কষ্টের মধ্যে কেউ হ্যাপি হয় নাকি?"

নিশ্চয়ই তুমি পুরাটা জানো না।"

- "পুরাটাই বলেছি।"
- "পঁচা গল্প!"
- "কি বললে মারিয়া???"

এমন কথা শুনে প্রচন্ড রাগ উঠে গেলো রাদিয়ার।

কত বড় সাহস, ফাতিমা (রাঃ) এর জীবনী সম্পর্কে এমন কথা বলে! "আরেকবার বলো দেখি?"

মায়ের রাগ দেখে মারিয়া এক দৌড়ে নিজের রুমে পালালো।

খুব অভিমান হচ্ছে মায়ের উপর।

সিভারেলার গল্প বলার সময় তো কত বুঝিয়েছিলো আম্মু, কষ্ট করলে পুরস্কার পাওয়া যায়।

তাহলে ফাতিমা কেন পেলো না?

"ধুর, আম্মু পুরাটা জানেই না।"

এদিকে অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করলো রাদিয়া। আসলে তো মারিয়ার দোষ না, ওকে তো কখনো ওভাবে শিখানো হয়নি।

প্রতিদিন বানোয়াট সব গল্প শুনে এখন সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য মনে করছে।

আর এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী রাদিয়া নিজেই।

কল্পনা শক্তির বিকাশে সহায়তা করতে গিয়ে মেয়েকে বাস্তব জ্ঞানহীন, উচ্চাভিলাষী বানিয়ে ফেলেছে।

আর নৈতিক শিক্ষা তো বাদই!

মেয়ের রুমের সামনে গিয়ে উঁকি দিলো রাদিয়া।

মারিয়ার হাতে 'আলাদীন'।

হঠাৎ প্রচণ্ড ভয় লাগলো তার।

"ও কি কি শিখেছে এর থেকে? ও কি আলাদীন এর মত চোর হবে, নাকি প্রিন্সেস জেসমিনের মত চোর বিয়ে করবে?"

মাথাটা মনে হচ্ছে চক্কর দিয়ে উঠলো রাদিয়ার।

নিজের রুমে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

অনেক দিন ধরে তাহাজ্জুদ এর নামায পড়ার ইচ্ছা ছিলো রাদিয়ার, কিন্তু উঠতে পারেনি।

আজ পেরেছে।

আল্লাহর কাছে খুব করে মারফ চেয়েছে নিজের ভুলের জন্য, আর সাহায্য চেয়েছে।

নামাজ শেষে মনটা অনেক হালকা লাগছে।

মনে নতুন একটা আশারও সঞ্চার হয়েছে।

মারিয়ার রুমে গিয়ে তাকে আশ্তে করে ডাকলো রাদিয়া।

মেয়ের ঘুম বেশ পাতলা।

ডাকতেই চোখ পিটপিট করে তাকালো।

- "এহহ...সকাল হয়ে গেছে?"
- "না, মা।"
- "তাহলে?"
- "কালকের গল্পটার শেষ মনে পড়েছে।"

শুনেই তড়াক করে উঠে বসলো মারিয়া, চোখে বিস্ময় নিয়ে।

রাদিয়া বললো, "তুমি ঠিকই বলেছিলে, ফাতিমার একটা প্যালেস হয়েছে।

খুব সুন্দর প্যালেস।

সেখানে সে সবাইকে নিয়ে সুখে শান্তিতে বাস করে।"

এবার মারিয়ার মুখে বিজয়ীর হাসি।

রাদিয়া আরো বললো", তবে কিনা প্যালেসটা এই পৃথিবীতে পায়নি। পেয়েছে জান্নাতে।

আল্লাহ তায়ালা তার সব কষ্টের পুরস্কার হিসেবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দিয়েছেন।

সেখানে সে যা চাইবে, তাই পাবে।"

মারিয়া চোখ বড় বড় করে সব শুনছে।

- "সত্যি যা চাইবে তাই পাবে?"
- "হ্যাঁ। অবশ্যই। তুমি গেলে তুমিও পাবে।"
- "কি করে যেতে পারবো আমি?"

আমি তো কষ্ট করি না কোন।

না খেয়ে থাকি না।"

- "না খেয়ে থাকতে হবে না।

খাওয়ার পর আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাবো।

যারা খেতে পায়না তাদের খাবার খেতে দিবে।"

- "আর?"

এরপর এক এক করে মেয়েকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল রাদিয়া।

ওদিকে মারিয়ার ও আগ্রহের যেন শেষ নাই।

মেয়ে যে তার এত ভালো রাদিয়া নিজেও মনে হয় জানতো না!

বারান্দায় বসে ভোরের আলোয় কুরআন তিলাওয়াত করছে রাদিয়া। পাশে মারিয়া। দুজনে আজ এক সাথে ফজর নামাজ পড়েছে।

- "আচ্ছা আম্মু, তুমি কি ম্যাজিক করতে জানো?"

এই রে, আবার রূপকথা আসলো কি করে!

রাদিয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মেয়ের দিকে।

মারিয়া নিজেই ব্যাখ্যা করলো, "তুমি যখন পড়ছিলে, তখন খুব ভালো লাগছিলো। মনে হচ্ছিলো যেন ম্যাজিক!"

মেয়ের কথায় হেসে কুটিকুটি রাদিয়া। একটু রহস্য করে বললো", তার কারণ, এর মধ্যে ম্যাজিক আছে।"

হাতের কুরআন টাকে উঁচু করে ধরলো।

- "আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এটা ভালো মানুষদের জন্য উপহার!
এর মধ্যে অনেক ভালো ভালো সত্যিকার কাহিনী আছে, আর-"

- "প্রিন্সেস ফাতিমার কাহিনীর মত?"
- "হুমা ওরকমও আছে।"
- "আমাকে শুনাবে?"
- "অবশ্যই।"
- "প্রতি রাতে?"
- "আচ্ছা!"
- "প্রমিস?"
- "ইন শা আল্লাহ, মা।

এখন থেকে প্রমিস না বলে আমরা ইন শা আল্লাহ বলবো, ঠিক আছে আস্মু ?
এবার যেয়ে আরেকটু ঘুমিয়ে নাও।"

মারিয়া উঠে নিজের ঘরের দিকে রওনা দিল।
রাদিয়া তাকে কি মনে করে আবার ডাক দিল।

- "মারিয়া!"
- "কি, আস্মু?"
- "এখন থেকে প্রিন্সেস ফাতিমা না বলে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলবো আমরা,
আচ্ছা?"
- "ইন শা আল্লাহ, আস্মু।"

মারিয়ার মুখে সুন্দর একটা হাসি খেলে গেল।
অবাক হল রাদিয়া।
বাচ্চারা কি সবাই এত সরল হয়?
এত সহজে বুঝে যায় সব?
নিশ্চয়ই আল্লাহ এর দেয়া ফিতরাতের কারণে!
অন্য বাচ্চাদের মায়েরা কি এটা উপলব্ধি করতে পেরেছে?

মারিয়া যাওয়ার পর নিজেও ঘরের ভিতর ঢুকলো রাদিয়া।
টেবিলের উপর একটা ডায়েরি ছিলো, সেটা খুঁজে বের করলো।
চেয়ারে বসে হাতে কলম নিলো।
মাথার মধ্যে খেলে যাচ্ছে রাসূল (সাঃ) এর জীবনীতে পড়া সব অসাধারণ ঘটনা,
কুরআনের সব অবাক করা কাহিনী।
ঠিক যেন রূপকথার মতই, কিন্তু সবই সত্য। একদম সত্য!

ছোটবেলা থেকেই লেখার হাত ভালো রাদিয়ার।
এবার অবশ্য গল্প না, সত্য কাহিনী লেখার পালা।
মারিয়ার মত কচি মন গুলোকে মিথ্যার জগত থেকে বাঁচাতে হবে যে!

* * * * *

পর্দার ফাঁক দিয়ে উদীয়মান সূর্যের আলো এসে রাদিয়ার ডায়েরির উপর ছেয়ে গেল,
যেখানে সে সদ্যই লিখেছে তার নতুন বই এর নাম - 'সত্য রূপকথা'

থার্মিফাস্টনামা

-হলি সুরভী

সদ্য কৈশোরভীর্ণ রোহান (মূল নাম রায়হান) আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থুতনির নীচে ওঠা একগাছি পাতলা দাড়ির আভাস পেয়ে ভীষণ পুলকিত বোধ করছে। যাক অবশেষে বুঝি তাহার দেখা পাইলাম। সমবয়সী সব বন্ধুদের দাড়ি-গোঁফ অনেক আগেই উঠে গেছে।

আলভি তো এর মধ্যে তিন তিনবার শেইভও নাকি করে ফেলেছে।

সেদিন জিসান বলল যে আড়ালে আবডালে মেয়েরা নাকি তাকে হাফ লেডিস বলে ডাকে (গায়ের রং টুকটুকে ফর্সা, জিরো ফিগার আর মাখনের মত ক্লিন চিক দেখে এই নামকরণ করা হয়েছে)।

রোহান সেদিন বাসায় এসে অনেক কেঁদেছিল। এত বেশি কেঁদেছিল যে পরদিন দুই চোখ ফুলে সুপারির মত গোল গোল অদ্ভুত টাইপের গিয়েছিল।

মা তো রোহানের চোখ দেখে দিশেহারা হয়ে গেলেন। তারপর বরফের টুকরো কাপড়ে বেধে চোখে সঁকে দিতে দিতে বললেন“ ,কিরে রাতভর কেঁদেছিস কেন”?

রোহান সত্যটা চেপে গিয়ে বলেছিল“ ,মা, নানীর কথা খুব মনে পড়ছিল। কতদিন দেখিনা!”

তীর একেবারে মোক্ষম জায়গায় গিয়ে লেগেছিল। এরপর শুরু হয়েছিল মায়ের কান্না দিবস। রাঁধতে-বাড়তে, কাজ করতে করতে চিকন সুরে কেঁদেই চলেছেন।

রোহান আহত চোখ মেলে বিরজি ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে মার কর্মকাণ্ড দেখছিল।

যাক সে কথা।

নিজেকে অন্যভাবে আবিষ্কার করতে পেরে বেশ ভাল লাগছে আজ। রোহান নিজের পাতলা গোঁফ আর দাড়ি নিয়ে বীরচিন্তে স্কুলে গেল। বন্ধুরা তাহার এহেন ট্রান্সফর্ম দেখে যারপরনাই মন খারাপ। কারন এতোদিন যেভাবে খুশি সেভাবে পঁচানো গিয়েছিল, এখন তো আর সেই পথ খোলা রইলো না।

বন্ধুরা গোপনে দীর্ঘ শ্বাস ফেলতে লাগলো।

ক্লাশের একটা মেয়ের প্রতি রোহানের নেক নজর অনেক আগেই পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু নিজের বাচ্চা বাচ্চা চেহারাটার জন্য কখনোই প্রপোজ করার সাহস করতে পারেনি। এখন নতুন করে মনের মরা গাঙ্গে আবারো ইশেকর জোয়ার বইতে শুরু করেছে।

সমস্যা হলো ,আগে মেয়েটা কথা বলত দু'এক বার। তার আনাড়ি জোকস শুনে হেসেও ছিল। কিন্তু এখন আর তেমন কথাও বলে না, কেমন যেন এড়িয়ে চলছে।

যাক সে সব কথা।

রোহানসহ আরো পাঁচজন বন্ধু মিলে ক্যান্টিন লাগোয়া পুকুরের পাড়ের মেহগনী গাছের নীচটায় বসে আড্ডা দিচ্ছিল। এমন সময় দীপ বলল“ ,হেই ব্রো! নেক্সট উইকে তো হ্যাপী নিউ ইয়ার। চল আমরা থার্টিফাস্ট নাইট সেলিব্রেট করি!”

সবার তীব্রমাত্রার সম্মতিতে ধ্রুবর বাসায় পার্টির আয়োজন করা হলো। ধ্রুবর বাবা আবার মিডিয়ার সাথে সম্পৃক্ত। তাদের ঘরে এ ধরনের পার্টি একেবারেই ডালভাত।

যেই ভাবা সেই কাজ। গ্রুপ স্টাডির নাম করে সন্ধ্যার দিকে রোহান ছুটল ধ্রুবর বাসায়। আগে কখনোই সে ধ্রুবদের বাসায় আসেনি। ওদের কালচার, সোশ্যাল স্টেটাস সব কিছুর কারনেই রোহান ধ্রুবর কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলত।

গেটের সামনে আসতেই হঠাৎ করেই যেন সব আগ্রহ কর্পূরের মত উড়ে গেল রোহানের।

অস্বস্তিবোধে ছেয়ে গেছে গোটা শরীর।

নাহ আমি পারব না!

আশপাশটা ভাল করে খেয়াল করে নিয়ে রাস্তার অপর প্রান্তে গিয়ে চুপচাপ দাড়িয়ে রইল সে। মনে মনে ভাবল পরিচিত কেউ যখন এ পথ ধরে আসবে তখন তার সাথেই ভেতরে ঢুকে যাবে। একা একা ভেতরে যাবার সাহসটা নিভে গেছে।

বেশিক্ষন অপেক্ষা করতে হলো না। গেটের সামনে একটা ঝা চকচকে ব্ল্যাক কালারের নতুন কার এসে থামল। কারের ভেতর থেকে মিনি স্কাট পরিহিতা নিশিকে বের হতে দেখে রোহান বোকা বনে গেল।

রোহান ভাবতেও পারেনি নিশিকে এভাবে এতো স্বল্প বসনে দেখবে।

লজ্জায় নিজের চোখ নামিয়ে নিল সে।

মনটা চিরতার চেয়েও তিতা হয়ে আছে। আধ ঘন্টার মধ্যে আরো তিনটে অপরিচিত মেয়ে আর বন্ধুদেরকে গেট দিয়ে ঢুকতে দেখল।

রোহান এবার একটা রিকশা নিয়ে সোজা বাসায় চলে আসলো। নাহ মনের ভেতরের গুমোট ভাবটা কেটে গেছে। চলে এসে ভালই করেছে, নিজেকে ফ্রেশ লাগছে।

বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে মায়ের রুমে গেল রোহান।

মা সুরতুলে কোরআন পড়ছেন। রোহান নিঃশব্দে মায়ের তিলাওয়াত শুনতে থাকে। মা কিছুক্ষণ তিলাওয়াত করে তারপর সেটার বাংলা তরজমাটাও টেনেটেনে পড়ছেন। তরজমায় কিয়ামতের আলামত, জাহান্নামের কঠোর শাস্তির কথা ছিল – যা পড়ার সময় মা কেঁপে কেঁপে কেঁদে উঠছিলেন।

রোহানেরও ভয় করছে, হাত পা শুকিয়ে আসছে। কারন আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন তিনি মিথ্যেবাদীদের কঠোর শাস্তি দেবেন।

কথায় কথায় মিথ্যে বলে মমতাময়ী মাকে বোকা বানানোর আর্ট কেউ রোহানের চেয়ে ভালো পারবে না। নিজের এই মিথ্যে বলার আর্টকে এতদিন অন্যতম গুণ হিসেবেই জানত সে।

অথচ আজ লজ্জা লাগছে, ভয় হচ্ছে!

মা তিলাওয়াত শেষ করে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন“ ,কিরে বাবা কিছু বলবি”?

রোহান মাথা নিচু করে বসে রইল।

– তোর স্টাডি কেমন হলো?

– সরি মা! আমি কোন স্টাডি করতে যাইনি। থার্ড ফাস্ট নাইট সেলিব্রেট করতে গিয়েছিলাম।

– এটা আবার কোন নাইট?

– নিউ ইয়ারের আগের রাতে নাচ গান, হই হুল্লোর এই আর কি।

– এসব করতে হয় না বাপ! এগুলো হারাম!!

রোহান মায়ের কোলে মাথা রেখে বলল,

– আচ্ছা মা আমি যদি পাহাড়ের চেয়েও উচু উচু গুনাহ করি, আল্লাহ পাক কি আমায় ক্ষমা করবেন?

- অবশ্যই বাবা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, গফুরুর রহীম। তবে তুমি যথাসম্ভব চেষ্টা করবে যাতে করে একই ভুল বারবার না হয়। শয়তান তোমার সামনে লক্ষ সুরতে এসে হানা দিবে যাতে তুমি পথ ভ্রষ্ট হও। আরেকটা কথা বাবা, তুমি মায়ের সাথে কখনোই মিথ্যে বলো না। শুধু মা কেন, কারো সাথেই না। আজ তুমি মিথ্যে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে, এমনটা যেন আর কক্ষনো না হয় ঠিক আছে?

-ওকে মা! মনে থাকবে।

রোহান বহুদিন পর আজকে নামাজে দাঁড়ালো। নামাজ শেষে দুহাত তুলে মোনাজাত করলো। নতুন বছরটা যেন তার আল্লাহ পাকের দিদার লাভের বছর হয়।

খুব ভোরে জিসানের আস্মু রোহানের মায়ের ফোনে কল দিলেন।

ফোন রিসিভ করতেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন জিসানের মা। রোহানের মা জিসানের আস্মুর কান্না শুনে ভড়কে গেলেন।

- কি হয়েছে ভাবী?

- ভাবী আপনার ছেলে রোহান কোথায়?

- রায়হান তো বাসায় ঘুমোচ্ছে। কেন?

- বাসায়? কিন্তু কালকে তো ওর অন্যদের সাথে গ্রুপ স্টাডির জন্য ধুবর বাসায় থাকার কথা ছিল।

- হ্যাঁ ছিল, কিন্তু সে যায়নি। গেট পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে চলে এসেছে। আরেকটা কথা, সেখানে কোন গ্রুপ স্টাডির বিষয় ছিলনা। ওরা থার্টিফার্স্ট নাইট, ওইয়ে কী যেন বলে ওই টাইপের কিছু নিয়ে একটা পার্টি ছিল।

জিসানের মা কেঁদে বললেন,

- দেখছেন ভাবী! ছেলে আমাকে মিথ্যে বলে বোকা বানিয়ে এখন নিজেই ধরা খেয়ে থানায় আছে। বিশ্বাস করেন ভাবী, আমার ছেলে এমন কাজ কখনোই করতে পারেনা। ওর অন্যান্য বন্ধুরাই ওকে ফাঁসিয়েছে। আমার আর কাউকে মুখ দেখানোর পথ রইলো না ভাবি!

- কাঁদবেন না ভাবি, কী হয়েছে একটু খুলে বলুন। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

- কী আর হবে ভাবী! কাল রাতের সেই পার্টিতে নাকি ওরা সবাই ড্রিন্ক করেছিল। নেশায় চুর হয়ে তাদেরই এক সহপাঠি নিশি নামের এক মেয়েকে সবাই মিলে রেপ করে ফেলেছে। মেয়েটা এখন ঢাকা মেডিক্যালে আছে। পুলিশের কাছে স্টেটমেন্ট দেবার সময় ও আপনার ছেলে ছাড়া বাকি সবার নাম নিয়েছে।

রোহানের মা ফোন কানে নিয়ে বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। আর ভাবতে লাগলেন, আমার আল্লাহ পাক যদি রহম না করতেন তাহলে এরকম জঘন্য পরিস্থিতি হয়তো আমিও রায়হান কে নিয়ে পড়তাম।

সত্য ঘটনা কখনো চাপা থাকে না। রোহান নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে করছে। সেদিন যদি এভাবে তার মনের গতি আল্লাহ পাক পরিবর্তন না করে দিতেন তাহলে তার নাম ও হয়তো সেই রিপস্টদের লিষ্টে থাকতো!

রোহান তওবা করলো, কখনোই সে আর মিথ্যে বলবে না।

এক থার্ড ফাস্ট নাইট পালন করতে গিয়ে হয়তো তার জীবনটাই বরবাদ হয়ে যেত।

আজ সে শিখে গেল,

হারাম অলয়েজ হারাম, সেটা কখনোই জীবনে সফলতা বয়ে আনে না!!

.....

أَيُّحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُثْرَكَ سُدًى

মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে?

[৭৫ : ৩৬]

দশ মিনিট

সিহিন্তা শরীফা

১।

সাধারণত বারান্দায় কোন কাজ থাকলে তাড়াতাড়ি সেরে চলে আসা হয়। আজ বিকেলে বারান্দায় শুকনো কাপড় তুলতে তুলতে গ্রিলের ফাঁকে বাইরে তাকালো দিয়া। বাড়িটা মেইন রোডের ওপরে হওয়াতে প্রতিদিন নানান দৃশ্য চোখে পড়ে।

কত মানুষ যাওয়া আসা করছে। প্রত্যেকটা জীবনে কত ব্যস্ততা, কত গল্প, কত কাহিনী... বিশেষ এক কারণে আজ মনটাও ভালো লাগছে না। হাতে এক গাদা কাপড়চোপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের রাস্তাটা দেখতে লাগল সে।

রাস্তার ওপারে একটা ফাস্টফুডের দোকান। দোকানের সামনে রিকশায় বসে আছে এক খোলা চুলের সুন্দরী। কিছুক্ষণ পর এক তরুন দোকান থেকে বের হয়ে এসে মেয়েটিকে কি যেন বলে আবার ভেতরে চলে গেল। মেয়েটির বয়স্ফেন্ড মনে হচ্ছে।

রিকশাওয়ালা বিরজিমাখা চেহারা নিয়ে রিকশা ধরে দাঁড়িয়ে আছে আবার তাকিয়ে তাকিয়ে মেয়েটিকে দেখছে। এই শ্রেণির মানুষগুলি একটু কেমন যেন – সুন্দরী দেখলেই হা করে চেয়ে থাকে। মেয়েটিরও দোষ আছে, এভাবে খোলামেলা চলাফেরা না করলে কি হয় না?

বোরখা পরিহিতা কমবয়সী মেয়েটি ছোট বোনের হাত ধরে সাবধানে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। একটু আগায় তো আরেকটু পেছোয়। আপাদমস্তক কালোয় মোড়ানো মেয়েটির চোখ দুটো শুধু বের হয়ে আছে। পিচ্চি বোনটার মাথাতেও হিজাব জড়ানো।

আজকাল এই শহরে কম বয়সী পর্দানশীন মেয়েদের সংখ্যা ভালোই বেড়েছে দেখা যাচ্ছে। এধরনের মেয়ে দেখলে শান্তিতে মনটা ভরে যায়। তবে চার পাঁচটা প্যাচ মেড়ে মাথায় উঁচু পট্টি বাঁধা হিজাবি দেখলে অসহ্য লাগে দিয়ার।

এক ভদ্রমহিলা “আই সিএনজি যাবা?” হেকে হাঁটতে হাঁটতে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন, পেছন থেকে কড়া গলায় ধমক লাগালেন তার স্বামী – “সিএনজি যাবে বলার পরেও কথা না বলে চলে গেলা যে? কানে শুনো না, না কি?” ভদ্রলোকের চীৎকার রাস্তার এপার থেকে শুনতে পেল দিয়া।

রাস্তার উপর যে লোক তার স্ত্রীর সাথে এমন ব্যবহার করে – ঘরের ভেতর না জানি কত অত্যাচার সহ্য করতে হয়। তবে প্রতিনিয়ত এসব শুনতে শুনতে অভ্যস্ত মনে হলো ভদ্রমহিলাকে। নির্বিকারভাবে হেঁটে সিএনজিতে গিয়ে বসলেন।

দোকানটার কর্মচারী এক ছেলে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বের হয়ে এলো ভেতর থেকে। হাতে এক গাদা প্লেইট। রাস্তার পাশে কাঁত করে পানি ফেলল। আবার হাসতে হাসতে ভেতরে চলে গেল। কিসের এত আনন্দ মনে – আল্লাহ ভালো জানেন। মজার কোন ঘটনা ঘটেছে হয়তো।

সেই ছেলেটি আবার বের হয়ে এসেছে রিকশার কাছে। মেয়েটিকে আবাবো কী যেন বলে ভেতরে চলে গেল। এবার বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছে মেয়েটির মাঝেও। কতক্ষণ আর এভাবে বসে থাকা যায়। রিকশাওয়ালা নিশ্চয়ই অনেক বেশি ভাড়া চাইবে। কেমন আড়চোখে বার বার দেখছে তাকে লোকটা।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ উঁচু স্বরে সেলফোনে কথা বলছেন। অপর পাশের কারো উদ্দেশ্যে আঙ্গুল তুলে উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলে চলেছেন“ ,আর এক ঘন্টা পর বাসায় ফিরব আমি...জি এক ঘন্টা পর...কাছাকাছিই আছি, তবে এক ঘন্টার আগে ফিরছি না আমি...” কার উপর অভিমান করে আছেন তিনি? নিশ্চই স্ত্রীর উপর!

২।

সিএনজি অটোরিকশাতে মুখ অন্ধকার করে বসে আছে স্নিগ্ধা। শুনেছে মার অবস্থা ভালো না, হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে আসা হয়েছে। স্নিগ্ধার বড় ভাই এসেছে ওকে মার কাছে নিয়ে যেতে। স্বামী জরুরী কাজে শহরের বাইরে আছেন। মা’র কথা শোনার পর থেকে ঠিকমত মাথা কাজ করছিল না মেয়েটির। বাসা থেকে বের হয়ে একটা সিএনজি অটোরিকশা দেখে ডাক দিল।

লোকটা কি বলল ভালো করে না শুনেই কী মনে করে সামনে হাঁটা দিল। ঠিক তখনই পেছন থেকে ভাইয়ার ধমক খেতে হলো। ভাইয়ার এই স্বভাবটা যে কবে বদলাবে, অনেক দিন পর ভাইয়ের ঝাড়ি খেয়ে মনটা হঠাত ভালো হয়ে গেল স্নিগ্ধার!

আব্দুস সবুর মিয়া চৌদ্দ বছর ধরে এই শহরে রিকশা চালায়। প্রতিদিন কত রকমের মানুষ তার রিকশায় ওঠা-নামা করে। আজ এক প্যাসেঞ্জারকে দেখে চমকে উঠল সে। অবিকল সুমাইয়ার মত দেখতে। সুমাইয়া তার বড় আদরের মেয়ে ছিল। শ্বশুর-বাড়িতে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছিল।

এই মেয়েটির মুখের আদল, চোখ-নাক-মুখ সব সুমাইয়ার সাথে মিলে যায়। কি আশ্চর্য! বার বার আড়চোখে দেখতে লাগল সে কন্যারূপি মেয়েটিকে। বাড়ি ফিরে জামিলাকে বলতে হবে ঘটনাটা।

সানজিদা আজ খুব বিরক্ত। গতকালই ঠিক করে রেখেছে আজ ক্লাস ফাঁকি দিয়ে শৌরভের সাথে ঘুরতে বের হবে, অথচ বের হওয়ার আগ মুহূর্তে ভাবী তার মেয়েকে ধরিয়ে দিলেন কোচিং এ নিয়ে যেতে হবে। ভাসিটির পাশেই ওর কোচিং সেন্টার কি না।

ভাগনীটা আবার রাস্তা পার হতে ভয় পায়। এমনতেই দেরী হয়ে যাচ্ছে। রাগে ওর হাত শক্ত করে ধরে টেনে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছে সানজিদা। সম্ভ্রান্ত ধার্মিক পরিবারে জন্ম হওয়ার কারনে ছোট থেকেই বাধ্য হয়ে কঠিন পর্দা করতে হয় ওকে। পরিবারের প্রত্যেকটা মেয়েকেই করতে হয়। এমনকি ছোট ভাগনীটাকেও ছাড় দেয়নি। কিছুদিন পর ওকেও সানজিদার মত প্যাকড হয়ে চলতে হবে। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবারো হাত ধরে টানতে লাগল ওকে।

অনেক্ষণ হয়ে গেল রাহাত খাবার অর্ডার করতে ফাস্টফুডের দোকানটাতে ঢুকেছে, রিকশায় বসে চুলে হাত বোলাতে বোলাতে অপেক্ষা করছে ফারজানা। আজ ওদের বিয়ের এক বছর পূর্ণ হলো। দুইজন বাইরে খাবে ঠিক করেছিল। অথচ রাহাতের ইচ্ছা খাবার কিনে বাসায় নিয়ে বাবা-মাকে সাথে নিয়ে খাবে।

এভাবে বসে থাকতে অস্বস্তি লাগছে ওর, রিকশাওয়ালা কেমন করে বার বার তাকাচ্ছে ওর দিকে। নেমে রাহাতের কাছে যাবে কি না ভাবছে, এমন সময় বের হয়ে রাহাত জানতে চাইল খাবারের সাথে কি ড্রিংকস নেয়া যায়।

রফিক সাহেবের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে তার মাথায় গন্ডগোল দেখা দিয়েছে। নিঃসন্তান এই বৃদ্ধ তার বৃদ্ধা স্ত্রীকে খুব ভালোবাসতেন, যদিও সারাজীবন তার সাথে অন্যায় করে গেছেন। ইদানিং যখন তখন ঘর থেকে কাউকে কিছু না বলে বের হয়ে যান, আবার কয়েক ঘন্টা রাস্তায় হাঁটার্হাটি করে নিজেই ফিরে আসেন। কখনো কখনো সেলফোন কানে দিয়ে মৃত স্ত্রীর সাথে কাল্পনিক কথাবার্তা, মান-অভিমান চালিয়ে যান।

কালামের মনে আজ বড় আনন্দ। ছয় মাস আগে এই ফাস্টফুডের দোকানে কাজ নিয়েছিল। বেতন ঠিকমতই দেয়, তবে মালিকের ব্যাবহার খুব খারাপ। আজ তুচ্ছ একটা কারণে পেছনের কিচেনে সহকর্মীদের সামনে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল। তখনই মনে মনে ঠিক করে রেখেছে কালাম, আজকেই কাজ ছেড়ে চলে যাবে সে। এবং বের হওয়ার আগে একটা প্রতিশোধ নিয়ে যাবে। ব্যাটা একটা প্লেইট ভাঙ্গার জন্য এত অপমান করলি, এখন ঠালা সামলা!

দশ মিনিট বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে পেছন ফিরল দিয়া। ঘরে ঢুকে হাতের কাপড়গুলো ভাঁজ না করেই স্তূপ করে ফেলে রাখলো এক কোণে। চারপাশের সবাই কত সুন্দর জীবন কাটাচ্ছে, যত সমস্যা শুধু আমার জীবনেই। অস্থির মনটা আরো অস্থির হয়ে গেল তার।

.

.

-রৌদ্রময়ী এডমিন

উপহার

রেহনুমা বিস্ত আনিস

উপহার পেতে কার না ভাল লাগে?

কিন্তু উপহার দেয়ার যে আনন্দ, সেটা উপহার পাবার আনন্দের চেয়ে শত, না হাজারগুন বেশি! কোন উপহার কেবল এর বস্তুগত মান কিংবা আর্থিক মূল্য দ্বারা বিবেচ্য নয়, বরং এটি মনের ভেতর সঞ্চিত শ্রদ্ধা ভালোবাসার উপচে পড়া ফল্গুধারার এক রংধনুময় বহিঃপ্রকাশ। কাউকে উপহার দেয়ার চিন্তা মাথায় এলে প্রথমেই মনের মুকুরে ভেসে ওঠে প্রিয় মানুষটির মুখখানি। সেই চেহারার সাথে জড়িয়ে আছে কত স্মৃতি, কত ভাল লাগা, ভালোবাসা, সম্মান, শ্রদ্ধা! কাউকে উপহার দেয়া মানে তাঁকে নিয়ে ভাবা, তাঁর পছন্দ অপছন্দ বিবেচনা করা, তাঁর প্রয়োজন মাথায় রাখা, তাঁর একফালি হাসির আশায় সময় ব্যয় করা, শ্রম দেয়া। এই ভালোবাসাটুকুই উপহারের মূল উপজীব্য। সেজন্যই রাসূল (সা) বেশি বেশি উপহার আদানপ্রদান করার উপদেশ দিয়েছেন। কারণ এর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্কের বাগানে নিত্য ফুটতে থাকে রঙ্গিন রঙ্গিন ফুল।

রাজারাজড়াদের উপহার উপটোকনের বর্ণাঢ্য কাহিনী পড়ে আমাদের ধারণা হয়ে গিয়েছে উপহার হতে হবে হীরে জহরত, মনি মুক্তো বা স্বর্ণখচিত পোশাকের মতই মূল্যবান কিছু। কিন্তু ভালোবাসার মূল্য কি অর্থ দিয়ে মাপা যায়? আমরা যখন ছাত্রী ছিলাম তখন আমাদের কাছে বাবামায়ের কষ্টার্জিত অর্থের মূল্য ছিলো অনেক বেশি। আমরা খুব অল্প খরচে চলতাম, এর মধ্যেই সবাই মিলে আনন্দ করতাম, উপহার দিতাম। প্রায়ই আমরা একে অপরকে বাগানের ফুল, ফুল দিয়ে গাঁথা মালা, কার্ড, স্টিকার, কলম, নোটবুক বা বই উপহার দিতাম। এর মূল্য ছিল বাহ্যত অল্প, কিন্তু এর

পেছনে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ কিংবা এর থেকে লব্ধ আনন্দের পরিমাণ কিছুতেই স্বল্প ছিলোনা।

অনেক উপহার আছে যা আমরা উপহার হিসেবে বিবেচনাই করিনা, অথচ এগুলো অমূল্য! আমরা তখন চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্রী। ছোট আঁচর আমি কোন কাজে পার্সিভাল হিলে গেলে এক মুদি দোকানে দাঁড়িয়ে এক বোতল কোক কিনে দু'জনে মিলে শেয়ার করে খেতাম। সে সময় দশটাকা দিয়ে এক বোতল কোক কিনে খাওয়া ছিল আমাদের জন্য বিলাসিতা। ও কয়েক ঢোক খেয়েই বলতে শুরু করত, 'আমি আর খেতে পারছি না, বাকীটা তুমি খাও'। উদ্দেশ্য আমাকে বেশি খাওয়ানো। খাবার পরিমাণটা অল্প হলেও সেটা দু'জনে মিলে উপভোগ করা ছিল আমাদের জন্য বন্ধুত্বের বহিঃপ্রকাশ। আমার ভালদাদু, আমার দাদার ছোটবোন। ভালদাদু নামটা আমারই দেয়া। দাদু আমার জন্য রান্না করার সময় বাছা চাউল আবার বাছত। কারণ আমি খাবার সময় মরা চাউল বাছি। এটাই ভালোবাসা। বিশ বছর পর আবার অ্যামেরিকায় বাস্কাবী মমির সাথে দেখা। ওর বাসায় খেতে বসে দেখি ও আমার পছন্দের সব আইটেম রান্না করেছে, এমনকি ভাতের সাথে আচার দিতেও ভোলেনি। মানুষের এই ছোট ছোট রুচিপছন্দগুলো মনে রাখা, এটাই কি আন্তরিকতা নয়?

সবচেয়ে ভাল উপহার সেটি যা ব্যক্তির পছন্দ এবং প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে দেয়া হয়। এতে বোঝা যায় আপনি সেই ব্যক্তিকে কত ভালভাবে জানেন, তাঁর পছন্দ অপছন্দ আপনার কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তাঁর প্রয়োজন আপনার কাছে কতটুকু অর্থবহ। প্রচুর মূল্য দিয়ে কিছু কিনে দেয়ার তুলনায় ব্যক্তির পছন্দনীয় বা প্রয়োজনীয় বস্তুটি তাঁকে উপহার দেয়া অনেক বেশি আবেগীয় মূল্যসম্পন্ন। তাই সবচেয়ে সুন্দর উপহার তাঁরই দিতে পারেন যারা সবচেয়ে বেশি আন্তরিকতাপূর্ণ। অবশ্য এক্ষেত্রে উপহারগ্রহীতার সাথে উপহারদাতার সম্পর্কের মাত্রাটাও একটা বড় বিবেচ্য বিষয়।

আপনি তাঁকে ততখানিই ভাল জানবেন যতখানি আপনি তাঁর সাথে মেশার সুযোগ পাবেন।

আমি সবসময় মনে রাখার চেষ্টা করি কার কোন উপহারে আমি আত্মতৃপ্ত হয়েছিলাম, যে অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল দীর্ঘ সময়। পরে কাউকে উপহার দেয়ার সময় এই স্মৃতিগুলো কাজে লাগে। যেমন বান্ধবী সিমিন আমাকে বিয়ের সময় একটি বেডসাইড ল্যাম্প উপহার দিয়েছিল। পরে ওকে বকা দিলাম, ‘তোমাদের না বলেছি বিয়েতে কেউ কিছু না দিতে?’ ও বলল, ‘শোন, জিনিসটার দাম অল্প। কিন্তু এর পেছনে আমার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। কর্মব্যস্ত দিনের শেষে তুমি ঘুমাতে যাবার আগে শেষ কি কাজটা করবে বল তো? বেডসাইড ল্যাম্পটা নিভাবে। তখনই তোমার আমার কথা মনে পড়বে। তোমাকে এই উপহারটা দেয়ার উদ্দেশ্য যেন প্রতিদিন ঘুমাতে যাবার আগে তোমার আমার কথা মনে পড়ে, আমি যেন তোমার দিনশেষের প্রার্থনার অংশ হতে পারি’।

কিছু কিছু উপহারের আর্থিক মূল্যের চেয়ে আবেগীয় মূল্য অনেক বেশি। ১৯৭১ সাল। ১৫ই ডিসেম্বর। চারিদিকে মূর্ত্তমূর্ত্ত বোমা বর্ষিত হচ্ছে। এর মধ্যে চট্টগ্রামের এক বাড়ীতে সিঁড়ির নীচে আশ্রয় নিয়ে বিয়ে পড়ানো হচ্ছে আমার বাবামায়ের। ষোড়শী বধূটির মন খারাপ। যুদ্ধের বাজারে কোথাও টিকলি পাওয়া যায়নি। গ্রামের মেয়ে। যতই যা কিছু দেয়া হোক না হোক, বিয়ের সাজসজ্জার অংশ হিসেবে টিকলি তার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে বরের মন খারাপ। শ্বশুরবাড়ি থেকে হাতঘড়ি দেয়া হয়েছে, কিন্তু যুদ্ধের বাজারে ভাল ঘড়ি পাওয়া যায়নি। এই কাহিনি আমাদের সবার জানা ছিল। আমি যখন চাকরী করতে শুরু করি তখন থেকে টাকা জমাতে শুরু করি। বাবামায়ের পঁচিশতম বিবাহবার্ষিকীতে আমরা ভাইবোনরা মিলে বাবাকে একটি ঘড়ি এবং আমার ভাই আহমাদের পরামর্শ মোতাবেক মাকে টিকলির পরিবর্তে একজোড়া কানের দুল

উপহার দেই। এটা ছিল আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার। কারণ এর মাধ্যমে আমরা বাবামায়ের পঁচিশ বছরের পুরোনো কিছু শখ পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

অনেকসময় আন্তরিক উপহারগুলো হয়ে থাকে অতি সাধারণ, কিন্তু এর পেছনে ভাবনা বা ভালোবাসার পরিমাণ হয় অসাধারণ। যেমন কেউ কিছু খেতে পছন্দ করে। আপনার বাসায় সেই জিনিসটি রান্না হয়েছে। আপনি তাঁকে এর অল্প কিছু পাঠিয়ে দিলেন অথবা তাঁর জন্য তুলে রাখলেন। আপনি যে তাঁকে মনে করলেন, এটাই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। যেমন তাসনিন আপা দইবড়া বানাতে আমার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। কারণ আমি এটি খেতে ভালবাসি কিন্তু বানাতে শিখিনি। হাতে বানানো উপহার সবসময় ক্রীত উপহারের চেয়ে বেশি মূল্যবান। কারণ এর সাথে উপহারদাতার সময়, শ্রম, ভাবনা এবং ভালোবাসার স্পর্শ মিশে থাকে। আমার এক ছাত্রী আমাকে নিজ হাতে কাজ করে একটি জামা উপহার দিয়েছিল। সেটি আমি আজও রেখে দিয়েছি। কারণ এটি ছিল তার ভালোবাসাপ্রসূত শ্রমের সাক্ষ্য।

কিছু উপহার আছে যেগুলো কোন উপলক্ষ্য কিংবা উপসর্গ ব্যতিরেকেই হঠাৎ করে দেয়া হয়ে থাকে। এগুলো আমার কাছে শ্রেষ্ঠ উপহার। রাসূল (সা) এমন উপহার প্রায়ই দিতেন। যেমন কেউ বলল, ‘আপনার চাদরটা তো ভারী সুন্দর!’ আর তিনি সাথে সাথে চাদরটি খুলে তাঁকে দিয়ে দিলেন। আমি যখন ক্যানাডা যাই, আমার সহকর্মী ছাত্রী সবাই মিলে এক বিদায়ী অনুষ্ঠান করেন। অনুষ্ঠান শেষে কিছু ছাত্রীর সাথে বসে কথা বলছিলাম। হঠাৎ আমার ছাত্রী সালেহা নিজের জামা থেকে ব্রুচটা খুলে আমাকে পরিয়ে দিয়ে বলল, ‘এটা ওখানেই বেশি ভাল মানাচ্ছে’। কোন আনুষ্ঠানিকতা নয়, বাহুল্য নয়, ‘স্পার অফ দ্য মোমেন্ট’ যাকে বলে। কিন্তু ঐ ব্রুচটা দেখলেই ওর কথা মনে হয়, জেগে ওঠে অনেক আনন্দ, বেদনা আর ভালোবাসার স্মৃতি। ক্যানাডা থেকে চলে আসার সময় আমাদের হাসিখুশি হাসি ভাবী এক দাওয়াতে আমাকে দেখে বললেন, ‘ভাবী, আপনি

এই জামাটা আর পরবেন না। বাসায় গিয়ে এটা খুলে রাখবেন। এরপর আমাকে দিয়ে যাবেন’। ভাবীর এই আন্তরিকতাপূর্ণ আবদার আমার কি যে ভাল লাগল! আমি জামাটা ধুয়ে ইস্ত্রি করে ভাবীকে পৌঁছে দিয়ে এলাম। ভালো লাগা, ভালোবাসার কথা এতটা হৃদয়তার সাথে ক’জন বলতে পারে?

উপহারদাতার সাথে পরিচিতির ক্ষেত্রে দুরত্ব থাকলে অনেকসময় উপহার নির্বাচন করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে কিছু কিছু উপহার আছে যেগুলো সর্বাবস্থায় কাজে লাগে। যেমন বই, খাতা, কলম, ঘরোয়া ব্যবহার্য জিনিসপত্র, চাদর, পোশাক, সাজসজ্জার উপকরণ ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোর ক্ষেত্রেও উপহারগ্রহীতার রুচিপছন্দ সম্পর্কে কিছুটা জানার প্রয়োজন রয়েছে। যেমন যিনি বিজ্ঞান পছন্দ করেন তাঁকে আপনি উপন্যাস ধরিয়ে দিলে তিনি খুব একটা আনন্দিত না হতে পারেন। আবার কেউ কেউ পোশাক বা সাজসজ্জার ব্যাপারে সংবেদনশীল হতে পারে। তখন এই উপহার তাঁকে আনন্দ দেয়ার পরিবর্তে বিব্রত করতে পারে, এমনকি বিরক্তির উদ্বেক করতে পারে।

তবে কিছু কিছু জিনিস পারতপক্ষে উপহার হিসেবে দেয়া উচিত নয় যদি না সেই ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। যেমন জুতো। প্রথমত কারো পায়ের সাইজ জানা থাকলেও একেক জনের একেক ধরনের জুতো আরাম লাগে বা একেক ধরনের জুতোয় সমস্যা থাকতে পারে। অনেক সময় লম্বায় পায়ের সাইজ ঠিক হলেও পাশে ফিট না হতে পারে। কিন্তু একেক সময় সবদিক ঠিক হয়েও শেষরক্ষা হয়না। আমি তখনো ছাত্রী। এক স্কুলে পার্টটাইম কাজ করি। দিনশেষে এক সিনিয়র সহকর্মী বললেন, ‘চল, তোমাকে বাসায় নামিয়ে দেই’। আমার বাসা ওনার বাসার পথেই। গাড়ীতে উঠে জানলাম সেদিন ভাইয়ার জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যে আপা তাঁকে পাঞ্জাবী, পাজামা আর একজোড়া স্যান্ডেল উপহার দিয়েছেন। কিন্তু সেদিন সকালে তাদের বগড়া হয়েছে। ভাইয়া বললেন, ‘বুঝলে রেহনুমা,

তোমার আপার সাথে ঝগড়া হয়েছে দেখে সে আমাকে জুতো দিল!’ আমি পড়লাম বিপদে। হাসলে আপা বেজার হবেন, না হাসলে ভাই।

আমার ভাল লাগে মানুষকে তাদের পছন্দের জিনিসটি দিতে, বিশেষ করে যা তাদের কাজে লাগবে, তাঁরা অবশ্যই জিনিসটি ব্যবহার করবেন। তাই ব্যক্তিগতভাবে আমি পছন্দ করি কাউকে নিয়ে বাজারে গিয়ে তাদের কিসের দিকে আকর্ষণ তা খেয়াল করতে এবং চুপটি করে তাদের পছন্দের জিনিসটি কিনে তাদের উপহার দিয়ে দিতে। তাহলে নিশ্চিত হওয়া যায় জিনিসটি তাদের পছন্দ হোল, কাজেও লাগল। যে জিনিস কারো কাজে লাগবেনা তা কেবল তাঁর ঘরে আবর্জনাই বৃদ্ধি করবে। কারণ আবেগীয় মূল্যের কারণে তা না যায় দেয়া, না যায় ফেলা। তবে অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই ধরনের উপহারগুলো রিসাইকেল করে দেন। সেক্ষেত্রে সেটি অন্তত অন্য কারো কাজে লাগে।

সবচেয়ে কঠিন হোল সামাজিক কারণে যে ফর্মাল উপহারগুলো দিতে হয় সেগুলো নির্বাচন করা। উপহারগ্রহীতার সাথে সম্পর্ক ব্যতিরেকে তাঁর রুচিপছন্দ বুঝা বা তাঁর জন্য উপহার নির্বাচন করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সেসব ক্ষেত্রে কেবল উপহারই নয়, পরিবেশন পদ্ধতিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপহারটি সুন্দরভাবে র্যাপ করে বা প্যাকেটে ভরে দেয়ার ওপর উপহারের ইম্প্রেশন অনেকখানি নির্ভর করে। তবে উপহার যাই হোকনা কেন, এর সাথে একগুচ্ছ ফুল কিন্তু চমৎকারভাবে পরিবেশনাকে প্রভাবিত করতে পারে।

উপহার দেয়া একটি অসাধারণ গুণ। কারণ এটি স্বয়ং আল্লাহতাআ’লার গুণ। তিনি উপহার দিতে ভালোবাসেন এবং দেয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করেন না। আমাদের এই শরীর, এই চোখজোড়া, এই কান দু’টো, এই ঠোঁট-জিহবা-স্বর, হাত পা, সুস্থতা, পরিবার, পরিবেশ পরিস্থিতি সবই আল্লাহপ্রদত্ত উপহার। তিনি পছন্দ করেন তাঁর বান্দারা তাঁর

গুণাবলী অনুসরণ করবে, যদিওবা তা হয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র মাপে। কিন্তু নানান কারণে আমাদের মাঝে উপহার দেয়ার প্রচলন হ্রাস পাচ্ছে। আর্থসামাজিক কারণ তো বটেই, আমাদের চিন্তাচেতনার পরিবর্তনও এর জন্য বহুলাংশে দায়ী।

আমরা নিজেদের জীবনপ্রণালী এতখানি বিলাসবহুল করে ফেলছি যে নিজেদের খরচ কুলিয়ে ওঠাই দায় হয়ে পড়ছে, অন্যের জন্য ব্যয় করার সুযোগ কোথায়? অপরদিকে আমরা ছোট ছোট উপহার দেয়া থেকে বিরত থাকি, কেবল বড় বা দামী উপহারকেই মূল্যায়ন করি। ফলে টুকটাক উপহার আদানপ্রদানের চর্চা আমাদের মাঝে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ব্যবহৃত জিনিস এখন আর উপহার হিসেবে প্রযোজ্য নয়, এমনকি অব্যবহৃত জিনিস রিসাইকেল করলেও আমরা ভাল মনে করিনা, ফলে উপহার দেয়া কঠিন হয়ে যায়। অথচ আমরা ভুলে যাচ্ছি উপহার কি দেয়া হোল সেটি নয়; বরং কে দিল, কাকে দিল এবং কি অনুভূতি নিয়ে দিল সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি এভাবে মূল্যায়ন করতে শিখি, তাহলে আবার আমাদের পক্ষে উপহার আদানপ্রদান সহজ হয়ে যাবে। সম্পর্কের বাগিচাগুলো ভরে উঠবে সুদৃশ্য এবং সুগন্ধি পুষ্পপল্লবে।

লাল সোয়েটার

বিনতে আব্দুল্লাহ

১.

দুপুরের রোদে বসেও ঠকঠক করে কাঁপছে ছোট্ট ইয়াসমিন। কারণ - একেতো শীতের আগমনী বার্তা হিসেবে কনকনে ঠান্ডা বাতাস বইছে, আবার গতকাল থেকেই ওর শরীরে জ্বর আসি আসি করছে। শুধু তাই না, পেটেও ভীষণ ক্ষুধা, মনে হচ্ছে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।

ইয়াসমিনের মা আনোয়ারা চুলায় রান্না চড়িয়েছে। শুধুই ভাত। লবন দিয়ে খাওয়া হবে। শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়ার আগে তাদের অবস্থা এমন ছিল না। ইয়াসমিনের বাবা ছিলেন একটি মসজিদের ইমাম, খেয়ে পড়ে ভালই ছিল তারা। প্রয়াত স্বামীর কথা মনে হতেই চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে গেল আনোয়ারার। পুড়ে যাওয়া খড়ি গুলোর মত পরিণতি হয়েছিল তার। সেকথা মনে পড়তেই দুহাতে মুখ গুজে কান্নায় ভেঙে পড়লো। স্বামীর শোকে আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে আশংকায়, আনোয়ারার কান্না সহসাই থামলো না।

এদিকে শীতে কম্পমান ইয়াসমিনের চিন্তায় এখন তার প্রিয় লাল সোয়েটার। গত বছর অনেক শখ করে কিনেছিল। সোয়েটারটা তাদের দেশে রয়ে গেছে। ইশ, কি সুন্দরই না ছিল সোয়েটারটা! বাড়িতে ফিরে গেলে সোয়েটারটা খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু এতদিন পর যদি না পাওয়া যায়? ভাবতেই ওর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পর মায়ের ডাকে একটু মনটা চনমনে হয়ে উঠলো ইয়াসমিনের। যাক, পেটের ইঁদুরগুলোকে এখন তাড়ানো যাবে। দুর্বল শরীর নিয়ে কোনমতে টলতে টলতে নিজেদের ছাউনির দিকে এগিয়ে গেল। আনোয়ারা তার জন্য গরম ভাত বেড়ে রেখেছে। থালাটা হাতে নিয়েই আবার রোদে এসে বসলো ইয়াসমিন। কিন্তু এক লোকমা খেয়ে দ্বিতীয় বার মুখে দেয়ার আগেই পাশের ছাউনির শিশু রফিক এসে সামনে দাড়ালো। ওর মা বাবা কেউ নেই, নানীর সাথে এসে আশ্রয় নিয়েছে। নানীর অবস্থাও ভাল না, খুব অসুখ। অযত্ন আর ক্ষুধায় ছেলেটার মুখ এতটুকু হয়ে গেছে।

ইয়াসমিনের খুব মায়া হলো। নিজের থালাটা রফিককে দিয়ে দিলো। রফিক খুশি মনে সেটা নিয়ে এক দৌড়ে নিজেদের ছাউনিতে চলে গেল। নিশ্চয়ই নানীর সাথে ভাগ করে খাবে। পেটে রয়ে যাওয়া ক্ষুধা সত্ত্বেও মনে মনে তৃপ্ত হলো ইয়াসমিন। তার বাবা তাকে সবসময় বলতেন - কাউকে কিছু দিয়ে উপকার করলে আল্লাহ তার থেকেও ভালো জিনিস দিয়ে পুরস্কৃত করবেন, হয় এই দুনিয়াতে আর না হয় আখিরাতে। এই ভাতের বদলে আল্লাহ তাকে কি দিবে ভাবতে থাকলো। এসব ভাবতে ভাবতেই মুখে হাসি ফুটল

ইয়াসমিনের, আর দূর থেকে তা দেখে মনটা হাল কা হলো আনোয়ারারও। নাহ, আল্লাহ আছেন তাদের সাথে। সবার ভবিষ্যৎ তো তাঁরই হাতে।

২.

আলমারি থেকে বের করে শীতের কাপড়গুলো বিছানার উপর রাখছে ফারিয়া। কিন্তু ছোট হাত দুটো হ্যাংগারে ঝোলানো কাপড়গুলোর নাগাল পাচ্ছে না। অনেক চিন্তা করে পাশের রুম থেকে টুল এনে সেটোর উপর উঠে তার পরে নাগাল পেল। সেখান থেকে নিজের সোয়েটারউফ। গুলো এনে বিছানায় জড়ো করলো। এবার বাছাই এর পালা। অসহায় মানুষদের শীতের কাপড় দান করবে, সেজন্য এত কিছু।

আম্মু বলেছে এই বছর 'মুহাজির' দের শীতের কাপড় পাঠাবে। মুহাজির কথাটার অর্থ ফারিয়া গতকাল শিখেছে। রাসুল (সাঃ) এর মত যারা ইসলাম পালনের কারণে নির্যাতিত হয়ে দেশত্যাগ বা হিজরত করেছে, তারাই মুহাজির। আর মুহাজিরদের যারা সাহায্য করে তারা হল আনসার। আল্লাহ মুহাজির আর আনসার উভয়কেই অনেক ভালোবাসেন আর তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন।

ফারিয়া চায় আনসারদের মত হতে, জান্নাতে যেতে। তাই সে তার কষ্ট হলেও তার প্রিয় সোয়েটারগুলো থেকে এক এক করে বাছাই করে ভাঁজ করতে লাগলো। এমন সময় ফারিয়ার মা রাদিয়া রুমে ঢুকলেন মেয়ের কাজ দেখতে। অবাক হয়ে দেখলেন প্রায় অর্ধেক কাপড়ই ফারিয়া দান করার জন্য গুছিয়ে রেখেছে।

রাদিয়া বাছাই করে রাখা সোয়েটারগুলোর মধ্য থেকে একটা হাতে নিলেন। লাল রং এর একটা সোয়েটার, বুকের উপর ডানদিকে আবার একটা হলুদ এমব্রয়ডারি করা ফুল। বিদেশ থেকে ফারিয়ার চাচা এনে দিয়েছিলেন। ওর খুব প্রিয় এটা।

- তুমি কি এই লাল সোয়েটারটাও দিয়ে দিতে চাও, ফারিয়া?
- হ্যাঁ, আম্মু!
- কিন্তু এটা তো দামী অনেক। এখনো ভালো আছে। আর...
- তার মানে এটা দান করলে বেশি সাওয়াব হবে, তাই না?

রাদিয়া কোন উত্তর দিতে পারলেননা। ঠিকই তো। দান করলে ভালো জিনিসই তো দান করা উচিত। যা নিজের জন্য অপছন্দ, তা অপরকে দিলে আর যাই হোক, সাওয়াবের আশা করা যাবে না।

আল্লাহর কাছে মনে মনে শুকরিয়া জানালেন রাদিয়া - উত্তম সন্তানের জন্য, উত্তম রিজিকের জন্য। মনে মনে দোয়া করলেন, যেন আল্লাহ তায়ালা সবাইকেই তার নিয়ামত উপলব্ধি করার তৌফিক দেন।

৩.

কয়দিন আগে জ্বর ছাড়লেও শরীরটা এখনো নাজুক ইয়াসমিনের। তাই আজকে শীতের কাপড় বিতরণ হচ্ছে শুনেও যেতে পারেনি। অবশ্য ওর মা গিয়েছে, একটা কিছু নিশ্চয়ই আনবে।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল কিন্তু আনোয়ারা ফিরলো না। ইয়াসমিনের এখন চিন্তা হচ্ছে। লাগবেনা শীতের কাপড়, মা ফিরে আসুক। বাবার মত মাও যদি হারিয়ে যায়, ও কি করে একা থাকবে?

সব দুশ্চিন্তার অবসান হল ইয়াসমিনের, ওর মা ঢোকার সাথে সাথেই। খুশিতে শোয়া ছেড়ে উঠে বসলো। ওর খুশি বহু গুণে বেড়ে গেলো মায়ের হাতের সোয়েটারটা দেখে।

একটা টুকটুকে লাল সোয়েটার। ওর যেমনটা ছিল, তার থেকেও বেশি সুন্দর। কারণ এটার বুকের উপর ডান দিকে একটা ফুলও আছে, একটা হলুদ রঙের ফুল।

ভালোবাসা

বিনতে আব্দুল্লাহ

সকাল ১১টা বেজে ২মিনিট।

হাত ঘড়িতে সময়টা দেখে নিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লো রাদিয়া। তার মেয়ের স্কুল ছুটি হতে এখনো এক ঘন্টা বাকি। আজ তার আরবি ক্লাসের প্রথম দিন ছিলো বলে আগে ভাগেই ক্লাস শেষ হলো, নাহলে মেয়ের স্কুল ছুটির কিছুক্ষণ আগেই তার ক্লাস শেষ হতো। ইচ্ছে করেই সে এই সময় বেছে নিয়েছে- মেয়েকে স্কুলে দিয়ে নিজের ক্লাসটাও সেরে নেয়া যাবে বলে। আব্দুল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া, সব কিছু এভাবে মিলিয়ে দেয়ার জন্য।

এক ঘন্টায় বাসায় গিয়ে যেহেতু লাভ নেই, তাই আরবি কোর্সের ওয়েটিং রুমে বসেই অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল রাদিয়া। কাছেই তার মেয়ের স্কুল, ছুটির ঘন্টা বাজলেও শুনতে পাবে এমন দূরত্ব। হঠাৎ রাদিয়ার দিকে একটি মেয়ে এগিয়ে আসলো, ক্র্যাচে ভর করে। তারপর তার পাশের চেয়ারে ধপাস করে বসলো। বসার সময় ক্র্যাচটা হাত থেকে পড়ে গেল মাটিতে। রাদিয়া জলদি করে সেটা তুলে দিল তার হাতে। তাতে মেয়েটি ভূবন ভোলানো হাসি হেসে বললো, “জাযাকিল্লাহ খাইর।”

রাদিয়াও প্রত্যুত্তর দিলো হাসি মুখে, কিন্তু মনটা বিষন্ন হয়ে গেলো। সকালে ক্লাসে ঢুকতেই অসম্ভব সুন্দর এই মেয়েটির দিকে চোখ পড়েছিলো তার। মনে মনে ভেবেছিলো, কতই না ভাগ্যবতী সে। আর এখন জুতার ফাক দিয়ে তার নকল পা জোড়া দেখে খারাপই লাগছে খুব। কি দুর্ভাগাই না মেয়েটি! কেমন করে এমন পরিণাম হলো কে জানে!

“আমার নাম রুকাইয়া। রুকাইয়া গোমেজ।”

মেয়েটির কথাতে হঠাৎ ভাবনায় ছেদ পড়লো রাদিয়ার। মনে হয় মেয়েটির হাতেও বেশ সময় আছে, তাই তার সাথে আলাপ করতে ইচ্ছুক। রাদিয়া খানিকটা ঘুরে বসে নিজের নাম বললো। ক্লাসমেট বলে কথা, বন্ধুত্ব যত জলদি হবে ততই ভালো। তাছাড়া

মেয়েটিকে নিয়ে রাদিয়ার মনে ইতিমধ্যেই অনেক কৌতুহল জন্মেছে। একটা প্রশ্ন না করে থাকতে পারলো না-

- “আপনি কি... মানে... রিভার্ট মুসলিম?”

- “জী। গত বছর শাহাদা নিয়েছিলাম। আগে খ্রিষ্টান ছিলাম। আমার মা বাবা এখনো তাই আছেন।”

- “তারা কি মেনে নিয়েছেন ব্যাপারটা?”

- “হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ। মেনে নিয়েছেন এবং আমাকে সব রকম সহযোগিতাই করেন। এই যেমন আমার এই আরবি ক্লাসে ভর্তি করে দিয়েছেন আমার বাবা, আমার অনুরোধে অবশ্য। আর আমাকে আনা নেয়া করেন আমার মা।”

- “তাই বুঝি! আর ভাই বোন?”

- “আমি একমাত্র সন্তান আমার মা বাবার।”

- “হাজব্যাড?”

- “হতে হতেও হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ। (হাসি) আমার একসিডেন্ট এর পর সে পিছটান দিয়েছে। তার দোষ দিবো না, পা হীন মেয়েকে কে স্ত্রী করতে চাইবে?”

- “স্যরি! এভাবে বলা উচিত হয়নি আমার।”

- “না না! ঠিক আছে। আলহামদুলিল্লাহ।”

রাদিয়া অবাক হলো। এই অল্প কদিনে নিজের ঈমানকে কোন পর্যায়ে নিয়ে গেছে রুকাইয়া! ঠোঁটে সারাক্ষণ হাসি আর কথায় কথায় আলহামদুলিল্লাহ! ত্রিশ বছরে সে যা আয়ত্ত করতে পারেনি, রুকাইয়া তা এক বছরে পেয়েছে। রাদিয়া প্রশ্ন করলো আবারও-

- “আমার না খুব জানতে ইচ্ছা হচ্ছে, আপনি মুসলিম হলেন কি করে। বলা যাবে কি?”

- “অবশ্যই! তবে সেটা কিন্তু অনেক লম্বা কাহিনী।”

- “আমার আপাতত অপেক্ষা করা ছাড়া কোন কাজ নেই।”

- “ঠিক আছে তাহলে। শুরু থেকেই বলি.....”

* * * *

“ছোটবেলা থেকেই আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলাম এবং দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করতাম। নিজ ধর্ম নিয়ে আমি গর্বিত ছিলাম। তবে, অন্য ধর্মের মানুষের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা ছিলো। আমি বিশ্বাস করতাম, সব ধর্মের উপর মানব ধর্ম।

স্বভাবতই আমি মুসলিম, হিন্দু – সহ সব ধর্মের বন্ধুদের সাথে চলাফেরা করতাম। সব ধর্মের আচার অনুষ্ঠান নিয়ে আমার আগ্রহ ছিল। তবে মুসলিমদের একত্রে নামাজ পড়া দেখতে আমার কেন জানি খুব ভালো লাগতো। মন খারাপ হলে বাসার কাছে মসজিদের কাছে চলে যেতাম। দূর থেকে মুসলিমদের সারি বেঁধে নামাজ পড়তে দেখলে মনটা শান্তিতে ভরে যেত।

পড়ালেখায় ভালোই ছিলাম সবসময়। কোন পরীক্ষায় আল্লাহ সেকেন্ড করেননি। এভাবে সাফল্যের সাথে স্কুল কলেজের পাঠ চুকিয়ে এক নামকরা ভার্টিসিটিতে ভর্তি হই। সেখানে এক খ্রিস্টান বন্ধু জুটে, নাম এরিক। সে অল্প সময়েই খুব ভালো বন্ধু হয়ে যায় আমার। এক সময় সে আমাকে ভালো লাগার কথা জানায়। আমারও তাকে অনেক ভালো লাগতো। আমরা ঠিক করি আমার পড়াশোনা শেষ হলে বিয়ে করবো। আমাদের পরিবারও সম্মতি দিয়ে দিয়েছিল এক কথাতেই।

এক সময় আমি অনার্স মাস্টার্স শেষ করে ফেলি ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট হয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় এর টিচার হওয়া সময়ের ব্যাপার। বিদেশের একটা নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপ ও যোগাড় হয়ে গিয়েছিল। সব মিলিয়ে আমি তখন হাওয়ায় ভাসছিলাম।

গত বছর ১৪ই ফেব্রুয়ারিতে আমাকে একটি পার্কে দেখা করতে বলে এরিক। আমি অনুমান করেছিলাম কেন ডেকেছে। আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার জন্য হয়তো। সেই চিন্তায় আমি সারাটা দিন বিভোর হয়ে ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, সবই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। আনমনা আমি পার্কে যাওয়ার পথেই একসিডেন্ট করি, আর পা দুটি হারাই।

সেদিনের পর এরিক আর কোনদিন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। প্রতিদিন তার ফোনের আশা করেছি, কিন্তু.... যাই হোক। একইসাথে আমার স্কলারশিপ, টিচার হওয়ার স্বপ্নগুলোও সব শেষ হয়ে গিয়েছিলো। পায়ের সাথে মেরুদণ্ডও বাজে ভাবে

ঘায়েল হওয়ায় আমি কয়েক মাস বিছানাতেই ছিলাম। সেই সময় আমার সঙ্গী ছিল কেবল- বাবা,মা আর ইন্টারনেট।

হ্যাঁ, তীব্র হতাশা কাটিয়ে উঠতেই সঙ্গী করেছিলাম ইন্টারনেটকে। আলহামদুলিল্লাহ, অজানা অনেক কিছু জানতে পেরেছিলাম তার ফলে। কিন্তু তবুও প্রতি রাতে ব্যথায় কাতরাতে থাকার সময় কোন ভাবেই চোখের পানি আটকাতে পারতাম না। নিজের জীবন নিয়ে কোন আশাই ছিল না আর।

এমনি এক রাতে, কেঁদে অস্থির হয়ে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম একটা, জীবনের মোড় ঘুড়ে গিয়েছিলো ওই এক স্বপ্নে।

স্বপ্নে আমি আপাদমস্তক ঢাকা কালো রং এর পোশাক পরে একটা মরুভূমির মধ্যে ছুটে বেড়াছিলাম। রাতের মরুভূমি, অন্ধকার চারিদিকে। আমি অসহায়ের মতো খালি ছুটছিলাম- একটু সাহায্যের আশায়। হঠাৎ দূরে আলো দেখে কাছে ছুটে কাছে যেতেই দেখি আগুন এর চারপাশে কিছু মানুষ, কারোরই চেহারা দেখা যাচ্ছিলো না।

আমি কাছে গেলাম। সবাই সরে গিয়ে আমাকে জায়গা করে দিলো। আমার সামনে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাকে দেখেই বুঝা যাচ্ছিলো যে তিনি সবার নেতা। তার চেহারাও ছায়ায় ঢাকা ছিলো। আমি মনে মনে ধরেই নিয়েছিলাম যে তিনি ছিলেন যীশু। কিন্তু একজন উনাকে সম্বোধন করলেন রাসূলুল্লাহ বলে। আমি বুঝে গেলাম, উনি মুহাম্মাদ (সাঃ)! সুবহানাল্লাহ!

মুহাম্মাদ (সাঃ) আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন- যীশু ছিলেন আমাদেরই মত একজন মানুষ ও আল্লাহর দাস। তিনিও আমাদের মত ঘুমাতে, আহার করতেন।

ব্যাস, অতটুকুই। এর পর আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি কাঁদতে থাকি। আমি বুঝতে পারি স্বপ্নটা অহেতুক ছিল না। হঠাৎ করে আমার মনে পরে যায় মসজিদের কথা, নামাজের দৃশ্যের কথা। আমি বুঝতে পারি আমার গন্তব্য কোথায়।

পরদিন সকালে আমি আমার বাবা মা কে সব খুলে বলি। তাদের বলি যে আমি মুসলিম হতে চাই। তারা অবাক হন, কিন্তু কেন যেন কোন প্রতিবাদ করলেন না। হয়তো আমি অসুস্থ ছিলাম বলে তারা আমাকে না করতে পারেননি।

তারপর সেদিনই, আমার এক মুসলিম বন্ধুর কাছে শাহাদা নেই আমি। আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন ছিলো সেদিন। আলহামদুলিল্লাহ।

আমাকে কেউ যদি প্রশ্ন করে, আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য কোনটি, আমি বলবো- আমার এক্সিডেন্ট। কারণ এর মাধ্যমেই আল্লাহ আমাকে ইসলামকে চেনার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সব হারিয়েই আমি আল্লাহর ভালোবাসা খুঁজে পেয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ.....”

* * * *

রুকাইয়া আর রাদিয়া, দুজনের চোখেই পানি। রাদিয়া যেন কিছু বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। রুকাইয়াই প্রথমে চোখ মুছে বললো- “স্যরি, এভাবে ইমোশানাল হয়ে পড়েছিলাম বলে। ওই যে আমার মা এসেছেন। আজ তাহলে উঠি।”

রাদিয়া চোখ মুছে তাকে উঠতে সাহায্য করলো। তাতে রুকাইয়া আবারও বললো, “জাযাকিল্লাহ”। এরপর মায়ের হাত ধরে হাসি মুখে বিদায় নিলো। এত সুন্দর হাসি রাদিয়া আগে কখনো দেখেনি। এত নূর আগে কারো চেহারায়ে দেখেনি।

রুকাইয়া চলে যাওয়ার পর রাদিয়া মনে মনে ভাবলো, সারাজীবন খালি আল্লাহর কাছে অভিযোগ করেছে কষ্ট নিয়ে। কখনো চিন্তাও করেনি প্রতিটি কষ্টের মধ্যে লুকিয়ে আছে আল্লাহর অনুগ্রহ। আমাদের কাছে টানতে আল্লাহর কত প্রয়াস, আমাদের প্রতি তাঁর কত ভালোবাসা! এমন ভালোবাসা উপেক্ষা করা যায় কী?

(গল্পটি কাল্পনিক, তবে এক নওমুসলিমের সত্যিকার জীবনকাহিনীর ছায়া অবলম্বনে লেখা)

অপরাজিতা

[হলি সুরভি]

১।

আচ্ছা ধরো আমার নাম অপরাজিতা, যার বর্তমান পরিচয় শুধু একটা লাশ। তাল পুকুরের চারপাশের ভীড়টা ক্রমশ বাড়ছে, আমি ভেসে ভেসে বেশ দেখতে পাচ্ছি। আমার অনেক লজ্জা লাগছে। কারন কাপড়চোপড় এলোমেলো হয়ে আছে, ঠিক করতে পারছি না। অথচ আমাকে আগে কেউ এভাবে বেপর্দা অবস্থায় দেখেনি। ভীষন অস্বস্তি হচ্ছে।

এরই মাঝে দেখলাম আলতাফ চেয়ারম্যান লাঠিয়াল বাহিনী নিয়ে এসেছেন। তাদের দিয়ে ঠ্যাংগিয়েও লোকজন সরাতে পারছেন না। চেয়ারম্যানের নির্দেশে চারজন গাউ গোড়া লোক পুকুরে নৌকা দিয়ে আমার লাশটাকে টেনে ডাম্পার কাছে নিয়ে আসলো।

সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত। কোন কোন স্থানে হাড়ও বের হয়ে গেছে। নিজেকে চিনতেই পারছি না। বড় চাদর পেঁচিয়ে আমাকে উঠোনের এক কোনায় জারুল গাছের ছায়ায় বিছানো চাটাইয়ের উপরে রেখে দিয়ে বাড়ির প্রাচীর লাগোয়া গেইট বন্ধ করে দিল। জনমানবশূন্য উঠোনে লাল শাড়ি পরে খুবলে খাওয়া টাটকা লাশ হয়ে পড়ে আছি। অদূরে কিছু পাইক পেয়াদা কারো নির্দেশের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান।

বাড়ির ভেতর থেকে একজন বয়স্ক মহিলা নাকে কাপড় চেপে কয়েক মিনিটের জন্য আমার কাছ থেকে ঘুরে গেলেন, চেহারার কাঠিন্য ভাব তখনও বিদ্যমান। ওনার চেহারার নমুনা দেখে আমার ভীষন হাসি পেল হা হা হা, তার স্বভাবটা বুঝি আর বদলালো না।

এক হাতে জ্বলন্ত আগর বাতি আরেক হাতে গোলাপজলের বোতল নিয়ে কেউ একজন কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে এল। এসেই আমার শরীরে গোলাপজল ছিটিয়ে দিতে লাগল। ওহ আমি তাকে চিনতে পেরেছি তাকে আমি চাচী বলে ডাকি। গোলাপ জলটা অসহ্য লাগছে। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল যে প্লিজ গায়ে দিওনা, ক্ষতগুলো জ্বলে যাচ্ছে। চাচী আমার দিকে তাকিয়ে কান্নার বেগ আরো বাড়িয়ে দিলেন, “তুই কেন এভাবে আমাকে না বলে চলে গেলি রে মা? তোর কিসের এত কষ্ট, অন্তত আমার সাথেই একটু শেরার করতিস”!

চাটীর কান্না দেখে এখন আমারো কান্না পাচ্ছে। কিন্তু আমার পাথর চোখে এখন আর জল নেই, পাথর হয়ে গেছে।

একটু পরে সা সা করে বেশ কয়েকটা গাড়ি বাড়ির সামনে এসে ভিড়ল। গাড়ি থেকে দু'জন মহিলা, দুটো বাচ্চা আর দু'জন পুরুষ লোক নামল। মহিলা দুটো আমার উপরে বিষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বাচ্চা দুটোকে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলে গেল। বাচ্চা দুটো কান্না করছিল ওরা নাকি আমাকে দেখতে চায়। জীবিত থাকতে ওদের সাথে আমার ভীষন খাতির ছিল। আমরা ছিলাম একে অপরের অন্তঃপ্রাণ।

কেউ একজন বারান্দায় এলো সাদা পাঞ্জাবী পরা, চোখে সানগ্লাস। দুঃখী দুঃখী চেহারা নিয়ে অস্থির ভাবে পায়চারি করে ফোনে কার সাথে যেন কথা বলছে। ওকে আমি বেশ চিনতে পারছি। আরে চিনবই না বা কেন! সে-ই তো আমার স্বামী। আহায়ে বেচারা বৌ হারিয়ে অপ্রকৃতস্থের মত হয়ে আছে। সকাল থেকে এখন পর্যন্ত কিছু খেয়েছে কিনা কে জানে? আমরা মেয়েরাও যে কি না! মরে গিয়েও শান্তি নাই, এখন ওকে হাতে তুলে খাইয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

রোদটা এখন মাথার উপরে, চিরবিরিয়ে গরম লাগছে। বেলা গড়ানোর সাথে পাঞ্জা দিয়ে উঠোনেও মানুষের জটলা বাড়ছে। আমি এবার একটু নস্টালজিক হয়ে পড়েছি।

আমার বিয়ের দিনও এভাবে সামিয়ানা টাঙ্গানো লাল-সাদা কাপড়ের নিচে অনেক মানুষ এসেছিল। সবাই কত হাসি খুশি, কতশত গল্পে মুখর এক আনন্দ ঘন পরিবেশের প্রতিচ্ছবি। বৌ সাজে আমি লাল টুকটুকে শাড়ি পড়ে বসে আছি। আজও কিন্তু লাল শাড়িতেই মুড়ে আছি, তবে লাল হয়ে। কী অদ্ভুত তাইনা!

আমার চোখ ঘুরে ফিরে কেবল দুজন মানুষকেই খুঁজে চলছে। তারা এখনও আসছে না কেন? পথে কোন সমস্যা হল নাতো! মনটা অস্থির লাগছে – কতদিন দু'চোখ ভরে তাদের দেখি না। অন্তত আজকে তো একটু আসলে পারে।

যা ভেবেছিলাম তাই হল, তারা ঝড়ের বেগে বাড়িতে ঢুকলেন। তারপর আমার মুখখানি আলতো করে তুলে ধরে কেঁদেই চলছেন। এখন আমার বুকে বড্ড অভিমান জমছে, আগে যখন এতো এতোবার বলেছিলাম একটু আসো তোমাদের দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। অনেক না বলা কথা বুকে জমতে জমতে বুক ব্যথা করছে। তখন তো শুনলেনা।

আর এখন!

আমি অসহায় লাচার, মুখ থাকে সত্ত্বেও জবান বন্ধ। কিছু বলার ক্ষমতা তো নিশ্চি-
রাতে মৃত্যু এসে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে।

আমার স্বামী ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। আমার পাশে যে দু'জন বসে কাঁদছেন তাদের
সাথে দেখা করতে। ও হ্যাঁ ঐ দুজনের সাথে তো আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেইনি।

তারা হলেন আমার মা-বাবা।

আমার স্বামী তাদেরকে ধরে ভীষন কান্না করতে লাগলেন। আমাকে ছাড়া যে তিনি একা
হয়ে গেলেন, এ শোক তিনি নিতে পারছেন না। আহা রেহা! শুনে আমরা কান্না পাচ্ছে।
বেঁচে থাকতে একদিনও যদি এমন একটা কথা সে বলত, তাহলে খুশিতে আমি পাগল
হয়ে যেতাম! আমি আরো ভেবেছিলাম সে বুঝি আমাকে কখনোই ভালোবাসেনা। যাকগে
সে সব কথা।

সবাইকে সরিয়ে দিয়ে একদল মহিলা আমাকে গোসল করিয়ে কাফনের সাদা কাপড়
পরিয়ে দিল। এবার আমি প্রস্তুত আমার আকাংখিত বাড়িতে যাবার জন্য। কত কত
বছর গড়িয়ে গেল সেখানে যাইনি। আমার যেন আর তর সইছেনা।

সূর্য পাটে নেমে গেল। রাত্রির অন্ধকার জেঁকে বসতে না বসতেই আকাশে থালার মত
একটা চাঁদ উঠল। চারদিকে আবহা ছায়ায় সবুজ গাছগুলোকে কালচে ভূতুরে লাগছে।

২।

অবশেষে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বাবা মায়ের সাথে গাড়িতে চাপলাম। গাড়ির ভেতরটা ভীষন
রকমের ঠান্ডা। শরীর জমে যাচ্ছিল, অথচ কেউ একটা কম্বলও দিলোনা। আমার বরটার
উপরে এখন ভীষন রাগ লাগছে।

ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা বলতে তো ভুলেই গেছি! সন্ধ্যায় পুলিশ এসেছিল আমাকে নিয়ে
যেতে। আমার শ্বশুরমশাই দেননি, তিনি অত্যন্ত কৌশলি মানুষ। অযাচিত ঝামেলা
এড়ানোর জন্য একগাদা টাকা দিয়ে এটাকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিয়েছেন। আমার
তখন পেট গুলিয়ে হাসি আসছিলো।

আমি এখন ঠান্ডা হীম করা একটা গাড়িতে। ছুটে চলছি তো চলছি। এ চলার কোন
বিরাম নেই। গাড়ির ঠাসা দেয়ালের কারনে চাঁদের আলোটা আমার গায়ে পড়ছেনা বলে
মন খারাপ লাগছে। জোছনার রূপটা কে আবাবো খুব করে দেখতে ইচ্ছে করছে। সেই

সাথে আমার বরের চেহারাটাও, কারন সে-ই গতকাল রাতে আমাকে চাঁদ দেখাবে বলে পুকুর পাড়ে নিয়ে গিয়েছিল।

আমরা পুকুর ঘাটে বসে জোছনা-স্নান করলাম। আমি তার ভালোবাসার চাদরে নিজেকে মুড়িয়ে ফেলেছি। নতুন করে তাকে আবারো বিশ্বাস করেছি। ভেবেছিলাম হয়ত নিজের ভুল বুঝতে পেরে পরকীয়া থেকে দূরে সরে এসেছে।

ও আমায় গান শোনালো, জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেল। আমি লজ্জায় চোখটা কেবল বন্ধ করছি মাত্র, ঠিক তখনই একটা ধাক্কা আমাকে ছিটকে পুকুরে নিয়ে ফেলল। সাঁতার জানিনা বলে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম, বরকে চিৎকার করে ডাকছিলাম। কিন্তু সে একটি বারও আমার দিকে ফিরে তাকাল না। আমি যন্ত্রনা ভোগ করতে করতে একসময় মরে গেলাম।

জানিনা বাবা-মা আমার মৃত্যুর জন্য কোনটা বিশ্বাস করেছে – হত্যা নাকি আত্মহত্যা। আসলে বিশ্বাস করলেই কি আর না করলেই কি! চেয়ারম্যান সাহেব, মানে আমার শ্বশুরের বিপক্ষে কিই বা করার ক্ষমতা আছে তাদের।

দুনিয়ার মানুষের কাছ থেকে ইনসাফ না পেলেও শেষ বিচারের দিনে আমার আল্লাহ অবশ্যই ইনসাফ করবেন ইনশাআল্লাহ।

কি বল তোমরা?

(২৭ অক্টোবর ২০১৭)

টেম্পার ট্যান্ট্রাম!

সিহিন্তা শরীফা

পাশের বাড়ির ভাবী এসেছেন বাসায়। আপনার আড়াই বছরের মেয়েটিকে ওর খেলনাগুলো দিয়ে কাছেই বসিয়ে দিলেন ভাবীর মেয়ের সাথে খেলতে। গল্প করছিলেন আপনারা, হঠাৎ চিৎকার শুনতে পেলেন। দৌড়ে গিয়ে দেখলেন আপনার মেয়ে অতিথির মেয়েকে মারছে, তার হাত থেকে নিজের খেলনা কেড়ে নিচ্ছে। সেই সাথে সমান তালে দুইজনই চিৎকার করে কাঁদছে। অপ্রস্তুত দুই মা সাথে সাথে রিএক্ট করে ফেললেন। আপনি মেয়েকে দুইটা মার লাগিয়ে দিলেন। প্রতিবেশি ভাবীও নিজের মেয়েকে টেনে নিয়ে বকা শুরু করলেন, ওকেই দোষারোপ করতে থাকলেন। চিৎকারের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। আপনার মেয়ে কিছুতেই নিজের খেলনা শেয়ার করতে রাজি না।

আপনার তিন বছরের একমাত্র ছেলেটি খাওয়া নিয়ে অনেক ঝামেলা করে। মুখ থেকে থু করে ফেলে দেয়, জোর করে খাওয়াতে গেলে জেদ করে হাতের কাছে যা পায় ছুড়ে ফেলতে থাকে।

আপনার দুই বছরের মেয়েটি মোবাইলে কার্টুন দেখছিল। একটা জরুরি ফোন করার জন্য হাত থেকে নিয়ে নিলেন আর সাথে সাথে শুরু হলো ছেলের চিৎকার। আপনি দিচ্ছেন না বলে একসময় মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। কাজেই বাধ্য হয়ে ওকে থামানোর জন্য তাড়াতাড়ি কাজ সেড়ে ফোনটা দিয়ে দিলেন হাতে।

শূন্য থেকে চার বছরের নিচের বাচ্চারা আক্ষরিক অর্থেই অবুঝ শিশু। ওরা যখন জেদ করে তা হলো রাগ আর হতাশার বায়োলজিক্যাল রেসপন্স। জোরে একটানা চিৎকার করতে থাকা, উলটো হয়ে পড়ে যাওয়া, হাত পা ছুড়তে থাকা, দম আটকে কাশতে কাশতে বমি করে দেয়া – এগুলোকে টেম্পার ট্যান্ট্রাম (temper tantrum) বলা হয়। টেম্পার ট্যান্ট্রাম সাধারণত দুই থেকে চার বছর বয়সীদের মাঝে বেশি দেখা যায়। সমবয়সীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে না পারা, নিজের কিছু শেয়ার করতে না চাওয়া – এগুলোও এই বয়সী শিশুদের বৈশিষ্ট্য। এর প্রতিকার সম্পর্কে জানার আগে আসুন জেনে নেই এর কারণ সম্পর্কে।

আমাদের মানবিক আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ও সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় মস্তিষ্কের প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স (prefrontal cortex) নামের অংশ থেকে। এই অংশটি আমাদের ব্রেইনের অন্য অন্য অংশের চাইতে সবচেয়ে দেরিতে ডেভেলপ হয়, এটি চার বছর বয়স থেকে পরিপূর্ণতা লাভ করতে শুরু করে। ঠিক একারণেই চার বছরের আগে শিশুদের সামাজিকতা আর মানবিক আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে ইম্যাচিওর্ড ধরা হয়। আর তাই এই বয়সে ওরকম জেদ অথবা অসামাজিক আচরণ করাটাই স্বাভাবিক।

চার বয়সের নিচের বাচ্চারা যুক্তি-তর্ক বোঝে না। চারপাশের সাধারণ ব্যাপার স্যাপার আমাদের কাছে স্বাভাবিক মনে হলেও ওদের কাছে তা দশ গুন বিভ্রান্তিকর। যেমন – পানির ফিল্টারের ট্যাপ ছেড়ে দিলে কী সুন্দর করে পানি পড়তে থাকে, বড়রা কেন এতে রাগ হয় তা ওর ছোট্ট মাথায় ঢোকে না। চকলেট, চিপস, আইসক্রিম খেতে কি মজা! বড়রা কেন খেতে নিষেধ করে তা কি ও বোঝে? ছোট্ট ভাইয়ার খেলনা ওর খেলতে ইচ্ছা করলে কেড়ে নিতেই পারে, এতে ওকেই কেন বকা দেয়া হবে? কার্টুন যে সময়টা সবচেয়ে বেশি মজা লাগতে থাকে, ঠিক তখনই মা আর দেখতে দেয় না! এসব কারণে জেদ করাটাই কি স্বাভাবিক না?

এই বয়সের শিশুরা যা বোঝাতে চায় বা বলতে চায় তা প্রকাশ করার সঠিক ভাষা ওর জানা থাকে না। বড়রা কি চায় তা-ও অনেক সময় বুঝতে কষ্ট হয়।

টেম্পার ট্যান্ট্রাম মূলত যে সব কারণে হয়ে থাকে:

ক. অনুভূতি প্রকাশের অযোগ্যতা

খ. স্বাধীনভাবে ইচ্ছেমত কিছু করতে না পারা

গ. পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকা

ঘ. ক্ষুধা, একঘেয়েমি, ক্লান্তি, বিষণ্ণতা ও অতিরিক্ত উত্তেজনা

এবার আমরা জানব এই সমস্যাগুলো কেমন করে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

১. রুটিন মেনে চলুন

প্রতিদিনের খাওয়া, ঘুম, বিশ্রাম, খেলার একটা প্রাত্যহিক রুটিন সেট করে ফেলুন।

দিনের প্রত্যেকটা কাজ সময়মত হলে বাচ্চার মেজাজ ঠিক থাকে। মাথা ঠান্ডা রাখতে পারলে অহেতুক জেদ করবে না, অল্পতে কষ্ট পেয়ে অসামাজিক আচরণও করবে না।

যৌথ পরিবারে রুটিন মেনে চলা মুশকিল, তবে একটু চেষ্টা করলেই কিন্তু সম্ভব।

২. ব্যস্ত রাখুন, সময় দিন

আপনার শিশুর ক্ষুধা, একঘেয়েমি, ক্লান্তি, বিষন্নতা ও অতিরিক্ত উত্তেজনা এড়াতে তার প্রয়োজনগুলো যথাসময়ে পূরণ করুন। এমন রুটিন সেট করবেন না যা বাচ্চার জন্য মেনে চলা কঠিন হয়ে পড়ে। বাসায় সবসময় হেলদি স্ন্যাকস, ফল ইত্যাদি রেডি রাখুন, বাচ্চার সময় কাটানোর প্রয়োজনীয় উপকরণও (খেলনা, বই ইত্যাদি) যেন হাতের কাছেই থাকে।

ঘুমানোর আগের সময়টা উত্তেজনাকর খেলাধুলা থেকে দূরে রাখুন। ওইসময় বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়লে (যেমন দৌড়াপ্প করা, অতিরিক্ত দুষ্টুমি, খিলখিল করে হাসা..) সহজে বিছানায় যেতে চাইবে না।

৩. নিষেধাজ্ঞার কারনগুলো দূর করুন

“এটা ধরো না”, “ওটা নিও না” অথবা “ওখানে যেও না”, “না, এটা কোর না”... এসব কথা যেন বলা না লাগে সেই ব্যাবস্থা করুন। অর্থাৎ, বাচ্চার জন্য বিভ্রান্তিকর, বিপদজনক এমন যে কোন কিছু ওর হাতের নাগাল থেকে সরিয়ে ফেলুন। আপনি যে ওর ভালোর জন্য বলছেন তা এই বয়সে ওর বোঝার কথা না। ঘরটাকে এমন রাখুন যেন ও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে।

৪. স্বাধীনভাবে বেছে নিতে দিন

খাওয়ার সময় ওর কাছে জানতে চান কোনটা খেতে চায় – এটা নাকি ওটা? সিম্পল অপশন দিন। জামা পরানোর সময় কোন রঙ পরবে জানতে চান – নীল নাকি সাদা? কিছু ব্যাপার ওর নিয়ন্ত্রণে আছে বুঝতে দিন।

৫. “হ্যা/না” বলুন, “হয়তো/হতে পারে” নয়

অস্পষ্ট, বিভ্রান্তিকর উত্তর দেয়া দেখে বিরত থাকুন। যখন বুঝতে পারে না আপনি কী বলতে চাচ্ছেন, ও তখন রেগে যায় আর জেদ করতে থাকে। অথচ এটা প্রকাশ করতে পারে না যে সে আপনার কথা বুঝতে পারছে না। কাজেই হ্যা অথবা না, যা বলবেন স্পষ্ট করে বলবেন। যেটা হ্যা বলবেন, সেটা না যেন না হয় খেয়াল রাখবেন।

অনেক সময় বাচ্চারা আপনার মনোযোগ পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত জেদ, কান্নাকাটি করে থাকে। ওকে পর্যাপ্ত সময় দিন। খাওয়ানো, ঘুম পارانোর কাজে না, এমনি বসে একটু খেলা করুন ওর সাথে। ডাক্তারের ওয়েটিং রুমে অথবা লং জার্নিতে – এমন কোন

সময় যখন দীর্ঘক্ষণ ওকে আপনার সাথে বসে থাকা লাগবে; ওর সাথে কথা বলুন, গেইম খেলুন।

এখন জেনে নেই জেদী বাচ্চাকে শান্ত করার কিছু উপায়।

১. জেদ শুরু হওয়ার সাথে সাথে, বা শুরু হতে যাচ্ছে বুঝতে পারলেই তাকে হাসানোর চেষ্টা করুন। যেমন একটা কলা নিয়ে কানে ফোনের মত ধরে হ্যালো হ্যালো করুন। তবে হাসানোর চেষ্টা করলে কিছু বাচ্চার কান্না আরো বেড়ে যায়, সেক্ষেত্রে অন্য পন্থা অবলম্বন করুন।

২. আপনার সোনামণির টেম্পার ট্যান্ড্রামের সময় কখনোই উলটো রাগ দেখাবেন না। গায়ে হাত তোলা বা বকাঝকা তো কখনোই নয়। ওর উপর চিৎকার না করে কোলে তুলে নিন, নরম স্বরে কথা বলুন। জানি এটা বলা যত সহজ করা ততই কঠিন। বাচ্চা যখন মাটিতে পড়ে হাত পা ছুড়তে থাকে, প্রতিবাদ করতে শ্বাস আটকে রাখে, এমন কি কোলে নিলে আপনাকে মারতে থাকে – জেনে নিন ওর বয়সির জন্য এসব স্বাভাবিক ট্যান্ড্রাম। ওই সময়টা যুক্তি-তর্ক কোন কাজে লাগবে না, ওর সাথে রাগারাগি করেও লাভ হবে না। বরং এতে জেদ আরো বাড়বে।

৩. ট্যান্ড্রাম যদি এমন পর্যায়ে থাকে যা বাচ্চার জন্য বা অন্য কারো জন্য ক্ষতিকর নয়, তাকে ইগনোর করুন। অহেতুক অনর্থক চিৎকার শুরু করলেই অন্য দিকে চলে যান, শুনতে পাচ্ছেন না এমন ভান করুন। এভাবে জেদ করে কোন লাভ হচ্ছে না বুঝতে দিন।

৪. জেদ করলেই যা চাই তা পাব – এমন একটা ধারণা যেন জন্ম না নেয়। আপনার মোবাইল নেয়ার জন্য জেদ করলে কিছুতেই মোবাইল ধরতে দিবেন না। আপনার কাজ শেষে মোবাইলটি ওর হাতের নাগালের বাইরে রেখে দিন। একবার যখন বুঝে ফেলবে যে এভাবে চাইলে কিছু পাওয়া যায় না, পরের বার আর এমন করবে না। কিন্তু জেদের ভয়ে একবার দিলেন তো দুইজনই হেরে গেলেন। ভবিষ্যতের জন্যেও তা সুখকর হবে না।

৫. বাইরে কোথাও গেলে অথবা বাসার অতিথির সামনে যদি ট্যান্ড্রাম শুরু করে, তাকে শান্তভাবে একই কথা বার বার বলে শান্ত করুন। অন্য কারো সামনে বকাঝকা করলে বা গায়ে হাত তুললে ও অপমানিত বোধ করবে, সেই সাথে ট্যান্ড্রাম আপনার কন্ট্রলের বাইরে চলে যেতে পারে।

৬. আপনার শিশুটি যদি জেদ করে অন্যকে মারতে থাকে বা জিনিসপত্র ছুড়তে থাকে, সাথে সাথে থাকে নিয়ে অন্য ঘরে চলে যান। কিছু না বলে শান্ত হতে সময় দিন। বিয়ের দাওয়াত বা রেস্টুরেন্টে এমন হলে সাথে নিয়ে বের হয়ে যাবেন। জড়িয়ে ধরে আদর করে শান্ত করুন। তারপর আবার ভেতরে নিয়ে যান।

৭. চার বছরের নিচের শিশুদের ট্যান্ট্রামের জন্য শাস্তি দেবেন না কখনোই। আর রেগে মারধোর করলে আপনি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে পারেন। পরে মাথা ঠান্ডা হলে নিজেরই আফসোস হবে। মনে রাখবেন, শারীরিক আঘাত করলে বাচ্চারা মানসিকভাবেও আঘাতপ্রাপ্ত হয়। শারীরিক আঘাত ক্ষণস্থায়ী হলেও মানসিক আঘাত দীর্ঘস্থায়ী।

আপনার সন্তান আপনার কথা শুনবে আপনাকে ভালোবাসে বলে, ভয় পেয়ে নয়। পরিশেষে দুআ করি আল্লাহ যেন প্রত্যেক মাকে অফুরন্ত ধৈর্য আর সহনশীলতা দান করেন। মা হিসেবে আল্লাহ যেই মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা যেন সঠিকভাবে পালন করার তৌফিক দান করেন। আমীন।

পাওয়া না পাওয়ার গল্প

হাসনীন চৌধুরী

আজ সুপ্তির বিয়ের সাত বছর পূর্ণ হলো। ওদের দু'জনেরই দিনটির কথা মনে আছে, কিন্তু কেউই এ ব্যাপারে সকাল থেকে কোন উচ্চবাচ্য করছে না। হাসান সকালে উঠেই গম্ভীর মুখে পেপার পড়তে পড়তে নাস্তা খেয়ে অফিসে চলে গেলো। সুপ্তিও ওর পাশে বসে নিঃশব্দে খেয়ে নিলো।

ও অফিসে যাবার পর, আরো একটি একাকী দিন শুরু হলো। তাদের শান্ত নিস্তব্ধ বিশাল বাড়িটি যেন আরো ঝিমিয়ে পড়লো। সুপ্তি জানে, আজো রাত করে বাড়ি ফিরবে হাসান, অন্য দিনের মতোই অনাদরে কেটে যাবে দিনটি। যদিও তারা আজকাল বিবাহ বার্ষিকী পালন করে না। তবুও দিনটির কথা ভুলে থাকাও সম্ভব নয়।

কারণ এই দিনের আরো একটি অর্থ আছে তাদের কাছে। বছর ঘুরে এ তারিখটি এলে, আরো তীব্র ভাবে মনে পড়ে যায় যে ব্যর্থতার আরো একটি বছর পূর্ণ হলো!! সবাই যখন জিজ্ঞেস করে, তোমাদের বিয়ের কতো গুলো বছর গেলো, কিন্তু এখনো তোমাদের.....

থাক..আর ভাবতে ইচ্ছে হয় না সুপ্তির। দু'হাত দিয়ে মাথা চেপে বসে পড়ে।

আজকাল মাঝে মাঝে মনে হয়, বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছে সে। পৃথিবীর সব কিছুই অসহ্য লাগে। কারো কোন আনন্দ তাকে স্পর্শ করে না। তার পুরো পৃথিবী জুড়ে যেন নীল বেদনার ছায়া।

অথচ কয়েক বছর আগেও সব অন্যরকম ছিলো। নিজেদের প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর কথা মনে পড়লো ওর। প্রথম দু এক বছর বেশ ঘটা করে দিনটি পালন করতো তারা। সেবার অফিসের কাজে এক সপ্তাহের জন্য বিদেশ গিয়েছিলো হাসান। সুপ্তি ওকে সারপ্রাইজ দেবার জন্য দীর্ঘ প্লেন জার্নি করে পৌঁছে গিয়েছিলো ভূমধ্যসাগর তীরের সেই ছোট্ট শহরটিতে।

ইটালিয়ান এক রেস্টুরেন্টে প্রচুর চীযের টপিং দেয়া বিশাল এক পিতয়া মারগারিটা খেয়েছিলো ডিনারে। অতঃপর ভরা পূর্ণিমায় অর্ধরাত্রি পর্যন্ত হেঁটেছিলো সাগরের বালুকাবেলায়। বিচের পাশের বিশাল পাথুরে চাঁই এর ওপর বসে, হাতে হাতে রেখে বিস্তীর্ণ আকাশের নিচে হাজারো তারার মেলায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলো দু'জনে।

সে রাতে হ্যাট পড়া বুড়ো ফুল ওয়ালার কাছ থেকে টকটকে লাল গোলাপ কিনে দিয়েছিলো হাসান। ডায়েরির ভাঁজে এখনো গোলাপটি রেখে দিয়েছে সুপ্তি। শুকিয়ে ম্লান হয়ে যাওয়া গোলাপের পাপড়ির দিকে তাকালে মনে হয়, তাদের ভালোবাসাও কি দিনে দিনে এমনি করে শুকিয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে! হাসান কি তাকে এখনো আগের মতো ভালবাসে, নাকি সব কিছুর জন্য তাকে দায়ী মনে করে!

চোখ ফেটে কান্না আসে সুপ্তির। আজকাল প্রায়ই এমন হয়। সারাদিন ঘর অন্ধকার করে দরজা বন্ধ করে কাঁদে ও। রান্নাবান্না ঘরের কাজ কিছুই করতে ইচ্ছে করে না। এমনো দিন যায়, হাসান অফিস থেকে এসে দেখে ঘরে কোন রান্না হয় নি। কিন্তু সে কখনোই কোন কিছুতে রাগ করে না। নির্বিবাদে বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আসে।

ওর এই নির্বিকার ভাব দেখে আরো রাগ ওঠে সুপ্তির। হাসানের কি কিছুতেই কিছু যায় আসে না, না কি ওর প্রতি অবহেলা আর করুণা বশত এই ভাবলেশহীন ব্যবহার করে!!

দরজা বন্ধ করে শোবার ঘরে খাটের এক কোনায় বসে পড়ে ও, পর্দা টেনে দেয়, সূর্যের আলো সহ্য হচ্ছে না। এরপর হাটু গেড়ে বসে কান্নায় ভেংগে পড়ে।

জরুরী মিটিং না থাকলে হাসান আজ অফিসে আসতো না। আজ সারাদিন তার সুপ্তিকে নিয়ে ঘুরতে ইচ্ছে হচ্ছে, বিয়ের পরের সেই প্রথম দিনগুলোর মতো করে। কি হাশিখুশি মেয়ে ছিলো ওর বউটি। সারাদিন কথার ফুলঝুরিতে চারদিক মাতিয়ে রাখতো।

ছোট বাচ্চাদের সাথে খুব জমতো ওর। বাচ্চা খুব ভালোবাসতো। কিন্তু এই একটি জিনিস এর অভাব, তাদের প্রচণ্ড সুখী জীবনে, উচ্ছল বউটির সকল উচ্ছলতায় যেন কালো মেঘে ঢেকে দিলো।

হাসানের ইচ্ছে করে পৃথিবীর সকল সুখ এনে প্রিয়তমার পায়ের কাছে রেখে দিতে। আগে বিবাহবার্ষিকী ভুলে গেলে, অভিমানে তুলকালাম কাণ্ড করতো সুপ্তি। আর এখন এই দিন সমাগত হলেই হাসানের আতংক বাড়তে থাকে। কারণ এ সময় অন্য দিনের চেয়েও যেন বেশি ডিপ্রেসড হয়ে পড়ে সুপ্তি।

একেকটা বছর যায়, আর সুপ্তির মনে হতে থাকে, না পাওয়ার আরো একটি বছর শেষ হলো। সন্তানহীন আরো বারোটা মাস গেলো! দিনে দিনে কেমন ডিপ্রেসনে চলে যাচ্ছে সে।

সাইকলজিস্ট ইকবাল আংকেলের সাথে কথা বলেছে হাসান। উনি বলেছেন সুপ্তিকে আনন্দে রাখতে। একা কম রাখতে।

হাসান তার পিএস কে দিয়ে আজ বিকেল চারটার কক্সবাজারের দুটো প্লেনের টিকেট করতে বলে। সুপ্তি সাগর ভালোবাসে, সাগর দেখলে ছেলেমানুষের মতো উচ্ছসিত হয়ে ওঠে। হাসান মিটিং শেষে সকাল সকাল বাসায় চলে আসে, সাথে নিয়ে আসে টকটকে রক্ত লাল সাতটি গোলাপ।

বেলা এগারটায় কলিং বেলের শব্দে চমকে ওঠে সুপ্তি। সকাল থেকে কাঁদতে কাঁদতে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেলেছে। মুখ ধুয়ে, গায়ে ওড়না পেঁচিয়ে দৌড়ে যায় দরজা খুলতে।

হাসান এক গুচ্ছ লাল গোলাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, গোলাপ গুলো ওর হাতে দিয়ে কানের কাছে ফিসফিস করে বললো,

“আমি কি আমার বউকে ফেরত পেতে পারি? আমার সেই কাজল পড়া লাজরাংগা সদা হাস্যময়ী বউটিকে?”

আমার বেগম কি জানেন, তাকে এই অধম কতটা ভালোবাসে, আর বেগমের সহচর্যে এই ছন্নছাড়া জীবন কতটা পূর্ণ হয়েছে!”

সুপ্তি আশ্তে করে দরজা ছেড়ে দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে, হাসান পেছন পেছন এসে ওর হাত ধরে বলে, “সুপ্তি প্লিথ বসো, তোমার সাথে জরুরী কথা ছিলো।”

ক্লান্ত স্বরে সুপ্তি জবাব দেয় “আমার কিছু শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে না, তাড়াতাড়ি বাসায় এসেছো কেন? কিছু ফেলে গেছো?”

“সুপ্তি আজ তোমাকে শুনতেই হবে, তোমার কোন অধিকার নেই আমার জীবন..... আমাদের জীবন এভাবে ধ্বংস করে দেবার!”

এবার সুপ্তি থমকে দাঁড়ায়। কঠিন স্বরে বলে “শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলে তাহলে, যে আমি তোমার জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছি, আমি একজন ব্যর্থ নারী!”

হাসান অধৈর্য হয়ে বলে উঠলো “উফ, তুমি কেন বোঝ না, তোমাকে নিয়ে আমি কতো সুখী! পৃথিবীতে সবার সব কিছু থাকে না, আর কোন নির্দিষ্ট বস্তু না পাওয়ার অর্থ এই নয় যে, জীবন ওর জন্য থেমে যাবে। কিংবা কখনোই তোমার দোয়া কবুল হবে না!!

আর তোমার তো কোন দোষ নেই, আমাদের ভাগ্য তো আমরা লিখি নি!! যা হচ্ছে, এর মাঝেও নিশ্চয় কোন কল্যান নিহিত আছে, যা আমরা এখন বুঝতে পারছি না। “

সুপ্তির চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় পানি পড়তে লাগলো, তবু চুপচাপ শুনতে লাগলো হাসানের কথা –

“এই দুনিয়াতে যতক্ষণ বেঁচে থাকবো সবাইকেই কিছু পরীক্ষা দিতে হবে। কোন না কোন না পাওয়া থাকবে। আবার না পাওয়ার ভীড়ে অনেক প্রাপ্তিও থাকবে। যেমন আমরা দু’জন একসাথে আছি, একে অপরকে সম্মান করি, ভালোবাসি, এসব কি অনেক বড় পাওয়া নয়! কত জনের জীবনে তো এগুলোও নেই। আমাদের কি উচিত নয়, যা আছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা!

এমন যদি হয় আমি বা তুমি কোন একজন, অপরের জীবন থেকে হারিয়ে গেলাম, তখন কি মনে হবে না, এই সময়গুলো অনেক ভালো ছিল! “

এবার সুপ্তি লাফ দিয়ে উঠে হাসানের মুখ চেপে ধরলো“ ,ছি: কি বলো এসব!”

“শোন, যে কৃতজ্ঞ হয় আল্লাহ্ তাকে আরো বাড়িয়ে দেন। আমি চাই এখন থেকে আমরা যা পেয়েছি, তা নিয়ে কৃতজ্ঞ থাকবো। আমাদের সম্পর্কের হেফাযতের জন্য দোয়া করবো আর অপেক্ষা করবো, আমাদের ভাগ্যেও আল্লাহ্ নিশ্চয় উত্তম কিছু দেবেন, সুন্দরতম ধৈর্যের বিনিময়ে। “

সুপ্তি আস্তে করে বললো“ ,সবই বুঝি, কিন্তু মন যে মানে না!”

“মন কে মানাতে হবে, এটাই আমাদের পরীক্ষা। যাও, উঠে পড়ো, মুখ হাত ধোও আর রেডি হয়ে এসো। আজ থেকে আমি আমার পুরোনো বউটিকে ফিরে পেতে চাই ও পুরোনো বউ এর সাথে নতুন করে জীবন শুরু করতে চাই।”

আধা ঘণ্টা পর.....

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে আছে সুপ্তি। পরনে হালকা আকাশী নীল জামদানী। অনেক দিন পর চোখ ভরে কাজল দিলো ও। আজ কেন যেন ওর খুব ইচ্ছে হচ্ছে ঝুম বুষ্টির মাঝে সাগর পাড়ে হাঁটতে। ইশ! হাসান কি জানে, তার বউ সাগরের কাছে যেতে ভীষণ ভালোবাসে??

লজ্জা

[আনিকা তুবা]

লজ্জা ঈমানের সাইন। মানুষের থেকে চেয়ে নিতে লজ্জা লাগার কথা, মানুষের সামনে কাপড় বদলাতে লজ্জা পাওয়ার কথা পরপুরুষ আর বেগানা নারীর দিকে তাকাতে লজ্জা লাগার কথা। এমনকি মা-মেয়ের মধ্যেও ইসলাম সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে- কেমন কাপড় পরতে হবে, কীভাবে আচরণ করতে হবে। একজন বাবা তার বালেক কন্যাকে ঠোঁটে চুমু দিতে পারবেন না। একজন মা তার পূর্ণবয়স্ক ছেলের সাথে এক বিছানায় শুতে পারবেন না। দুই বোন বড় হওয়ার পর আর এক লেপের নিচে শোয়ার নিয়ম নেই।

ইসলাম আল্লাহর তা'আলার নির্ধারিত দ্বীন, তাই এর সবকিছুই সুন্দর। সবকিছুই সামঞ্জস্যপূর্ণ। লজ্জাকে আল্লাহ ঈমানের চিহ্ন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। খারাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে, এমন কোনো পথ পর্যন্ত ইসলামে খোলা রাখা হয় নি।

সেকুলারিজম ঠিক উল্টো। নষ্টামি, নোত্রামি, অশ্লীলতার দিকে নিয়ে যেতে পারে এমন সবকিছুই এখানে শেখানো হয়। বিনোদনের নামে এখানে সব জায়েজ। নারীরা তাদের সংবেদনশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উন্মুক্ত করে দিচ্ছে, যে যত বেশি শরীর দেখাতে পারবে, সে তত বেশি “সাহসী”। অভিনয়ের নামে নারী-পুরুষ ইচ্ছামত যাকে-তাকে ধরাধরি করে, স্বামী-স্ত্রীর চেয়েও ঘনিষ্ঠ আচরণ সবার সামনেই হয়, পর্দার আড়ালে কী হয় সহজেই অনুমেয়।

ফটোজেনিক আর সুন্দরী প্রতিযোগিতার ধোঁয়া তুলে কমবয়সী মেয়েদের শরীর নিলামে তোলা হয়, সেই সাথে কতজনের কুমারিত্ব হারায় তার ইয়ত্তা নেই। চকোলেট ডে, প্রপোজ ডে, ভ্যালেন্টাইন ডে'র নামে তরুণ-তরুণীদের মেলামেশার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে, “কাছে আসার গল্প” নাম দিয়ে সেগুলো ভালোবাসার আদর্শ কাহিনী হিসেবে প্রচার করা হয়।

লজ্জাকে এ সমাজে নিচু চোখে দেখতে শেখানো হয়। তাই লজ্জা পাওয়া মানেই ভীষণতা। আর নির্লজ্জ হওয়ার নতুন সংজ্ঞা হল সাহসী। কেউ অভিনয়ের নামে উলঙ্গ হয়ে গেলে বলা হয়, সাহসী দৃশ্যে অভিনয় করেছে। আগে নতুন বউ ভাবলেই চোখে ভাসতো মাথা নিচু করে থাকা লাজুক এক কনের দৃশ্য। এখন বিভিন্ন ওয়েডিং ফটোগ্রাফিক পিকচারে বোঝা যায়, বিয়ের দিনে যে বউ যত “বোল্ড” হতে পারবে, সে ততই স্টাইলিশ। বউ রিকশার উপর চালকের আসনে বসে আছে, কিংবা চোখে সানগ্লাস পরে সেজে, ইয়ো-ইয়ো ভাব নিয়ে ছবি তুলছে।

এটাই সাহসিকতার নমুনা।

ওয়েডিং ফটোগ্রাফির নামে কনের লজ্জাকে একেবারে জবাই করে দেওয়া হয়েছে। কনে স্বামীর সাথে সুন্দর সময় কাটানোর বদলে বরং ফটোগ্রাফারের জন্য পোজ দিতে ব্যস্ত। স্টেইজে বসে, দাঁড়িয়ে, এমন কি শুয়ে ছবি তোলা হয়। ছবির পোজ দিতে গিয়ে তথাকথিত “ভদ্র” ঘরের নারী-পুরুষরা বিয়ের হলকেই যেন তাদের বেডরুম বানিয়ে ফেলে।

সেকুলার সমাজব্যবস্থায় স্বাধীনতা আর সাহসিকতার নামে নির্লজ্জতার চাষ হয়, রাসূল (সা) এর চোখে এই কাজগুলো নিশ্চিত নষ্টামি আর নোংরামি হিসেবে গণ্য হতো। নোংরামির নাম বদলে ফেললেই সেটা সুন্দর হয়ে যায় না। সেকুলারিজমের ছোঁয়ায় এখন পার্ক, রেস্টুরেন্ট, রাস্তাঘাটে জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়ে ঘোরে। এরাও সব ভদ্র ঘরেরই সন্তান। এদের ক্ষণিকের সুখের পরিণতি হিসেবে ডাস্টবিন আর নালা-নর্দমায় জমা হয় অবৈধ জরায়ু আর সদ্যজাত শিশুগুলো। এদেরকে শেখানো হয়েছিল – ছেলেমেয়ে একসাথে কথা বলতে, বন্ধুত্ব করতে কোনো সমস্যা নেই। যেই বয়সে এরা লজ্জার বাধ ভেঙে বিছানায় যেতে পারে, সেই বয়সে সন্তানের বাবা হতে তারা প্রস্তুত নয়। অল্পবয়সে সন্তানের দায়িত্ব নেওয়ার কথা এদেরকে শেখানো হয়নি।

সেকুলারিজম বলে বোরকা পরা মানে ঘরবন্দী, বর্বর। ওড়না না পরা আধুনিকতার প্রতীক। ছেলেমেয়ের অবাধ বন্ধুত্ব কোনো বাধা নেই। দুই পক্ষের সম্মতিতে বিছানায় যেতে সমস্যা নেই। পরকীয়া করার স্বাধীনতা আছে। অভিনয় করার জন্য, সুপারস্টার হওয়ার জন্য টুকটাক দেহ বিলানোতে বাধা কি? ঠিক আছে। কিন্তু নারীদের নিরাপত্তা, ধর্ষণ, যৌন-নিপীড়ন, ভ্রূণহত্যা, অ্যাবরশন, ডিভোর্স, আত্মহত্যা- এগুলোর সমাধান কে দেবে? এসব অপপ্রত্যাশিত ঘটনার দায়দায়িত্ব সেকুলারগণ নেয় না। তারা শুধু নষ্টামি উসকে দিতে আগ্রহী।

সেকুলারিজম একটা মিথ্যা কোড-অফ-লাইফ, একটা ভ্রান্ত, ভুলে ভরা জীবনব্যবস্থা। যে সেকুলারিজমের অনুসরণ করবে, সে নামে মুসলিম হলেও জীবনে শান্তির স্বাদ পাবে না।

ইসলাম একমাত্র সত্য দ্বীন- সত্য ও সঠিক জীবনব্যবস্থা। সবচাইতে কল্যাণকর জীবনব্যবস্থাও ইসলাম। চৌদ্দশ বছর আগে যে বিধানগুলো এসেছিল, সেই বিধান পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তবায়ন করার কারণেই সাহাবীদের যুগটা ছিল শ্রেষ্ঠ যুগ। সে যুগেই তৈরি জন্ম হয়েছে সবচেয়ে অসাধারণ সব ব্যক্তিত্ব। সে যুগে অপপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে সবচেয়ে কম। এখনকার জীবনকে মাপার মাপকাঠি হয়ে গেছে টাকা-পয়সা, লোক-দেখানো অনুষ্ঠান, খ্যাতি এইসব। এগুলো পাবার আশায় মানুষ নষ্ট হয়ে যেতেও পরোয়া করে না। অথচ নির্লজ্জ, নোংরা, ঘুণে ধরা টালমাটাল একটা জীবনের চাইতে সহজ-সাধারণ-ভারসাম্যময় একটা জীবন অনেক বেশি সুন্দর।

পহেলা বসন্ত

-নূরুন আলা নূর

১.

ঘুম থেকে উঠেই মন ভালো হয়ে গেলো শিফুর। আজকে পহেলা বসন্ত। ক্যাম্পাসে ফাঁলি, মেলা আরো কত কি। গত এক সপ্তাহ ধরে মার্কেট ঘুরে কাঁচি হলুদ রঙের শাড়ি কিনেছে। সেই সাথে ম্যাচিং ফুলের গয়নাও রেডি। শিফুরা সব বন্ধুরা মিলে দারুণ মাস্তি করবে আজ।

ঘুমাতে রোজ দুইটা আড়াইটা বেজে যায়। সকাল ৯/১০টার আগে উঠতে পারেনা কিছুতেই। কিন্তু আজকের কথা আলাদা। উত্তেজনায় সারা রাত ঘুমাতে পারেনি। সকালে মোবাইলটা এলার্ম দিতেই ঘুম ভেঙে গেল তার।

আজকে অনেক প্ল্যান - ভাবতে ভাবতে বাথরুমে ঢোকে, ফ্রেশ হয়, ব্রাশ করে। আজকের সাজটা আর সবার চেয়ে ভিন্ন হওয়া চাই। আজকে দেখতে সবার চেয়ে সুন্দর লাগা চাই। ঝটপট রেডি হওয়া শুরু করে সে বাথরুম থেকে বের হয়ে।

- মা কুচিটা বাঁকা হয়ে গেলো তো!

- কই বাঁকা হল! একদম সোজা পাটপাট করে ভাজ করে দিয়েছি।

- আরে না না আবার খুলে ঠিক করে দাও। ঠিকমত হয়নি।

- এত বুঝিস তো নিজে পরিস না ক্যান?

গজ গজ করতে করতে আবার কুচি খুলে ঠিক করে দেন রাবেয়া বেগম। মেয়ের এসব নখরার সাথে ভালো রকম পরিচিত তিনি। স্কুলে থাকতে এই মেয়েকে চুল বেঁধে দিতে কালোঘাম ছুটে যেত তার। এই পাশ উচু কেন, এই দিক নিচু কেন নানা বায়ানাক্ষা করে বারবার চুল খুলে বেঁধে দিতে হত। মন মত হওয়ার আগ পর্যন্ত ঘ্যানঘ্যান করত। এখন তাও নিজের চুল নিজে বাঁধে। বাঁধে আর কি, স্ট্রেটনার দিয়ে সোজা করে নয়ত রোলার দিয়ে কার্ল। এই করে করে চুলের বারোটা বাজাচ্ছে।

শাড়ি পরে, মেকআপ করে নেয় ঝটপট। পাকা হাতে মেকআপ করতে খুব কম সময় লাগে শিফুর। চুল সেট করে ফুলের গয়না গায়ে দিয়ে বেড়িয়ে পরে সে।

২.

ক্যাম্পাসে ঢুকতেই উৎসবের ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে । সবাই রঙ বেরং এর পোশাকে । অধিকাংশই শাড়ি-পাঞ্জাবী । আর যারা শাড়ি/পাঞ্জাবী পরেনি, তারাও অন্তত লাল হলুদ পোশাকে এসেছে ।

সবাই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত । কেউ মেলায় ঘুরছে, কেউ মেহেদি দিচ্ছে, পিঠা কিনে খাচ্ছে কেউ । আর অধিকাংশই ছবি তুলছে নিজেদের । শিফুও ব্যস্ত হয়ে যায় নিজের সার্কেল নিয়ে । এমা, মেহজাবীন, কণা, রাসেল, শাহেদ, ওরা শিফুর বন্ধু । তুই তোকারি সম্পর্ক সবার । যারা বলে, “ল্যাড়কা ওউর ল্যাড়কিকে বিচ কাভি দোস্তি নেহি হোতি” তাদের দিকে ঝুঁকুঁচকে তাকায় ওরা । কে বলেছে ফ্রেন্ডশিপ হয়না । ওরা তো ফ্রেন্ড ছাড়া আর কিছু ভাবেনা নিজেদের । যদিও মাঝে মাঝে শাহেদের এলোমেলো খাপছাড়া এসএমএস গুলো ভাবনায় ফেলে দেয় শিফুকে ।

- এই শিফুর বাচ্চা, আরেকটু হলেই তো র্যালি মিস করতি।
- আরে ইউনির সামনের গলিতে মরার জ্যামেই তো এত লেট হয়ে গেল।
- আরে এসব পরে শোনা যাবে চল চল, শুরু হয়ে যাচ্ছে র্যালি।

প্রতিবছরেই বসন্ত মেলার মূল আকর্ষণ থাকে এই র্যালি । ঢোলের তালে হাটে হাটে কখন যে নাচা শুরু করে ওরা নিজেই বুঝতে পারেনা । মুখে মুখে হই হই বলে তাল দিচ্ছে সবাই । গলা ফাটিয়ে চৈঁচাচ্ছে, একে অন্যকে ডাকছে, ছবি তুলছে, হাসছে, আনন্দ করছে ।

সবার হাতেই মোবাইল, ক্যামেরা । কার ক্যামেরায় কে বন্দী হচ্ছে বোঝা দায় ।

- এই ফেবুর থ্রোপিক তুলি চল চল।
- পাউট কর পাউট কর।
- এইবার ইনোসেন্ট ফেইস কর সবাই।
- এইবার দাঁত বের করে হাসি সবার।
- কোমরে হাত দিয়ে নাচের স্টাইলে দাঁড়া।

ছবি তোলা যেন শেষ হয় না। সবার মোবাইলেই তোলা হয় অসংখ্য গ্রুপ ছবি। আশেপাশের অপরিচিত মোবাইলেও নিজের অজান্তে কত ছবি উঠে যায় ওদের। কিন্তু সেসব ভাবার সময় কই।

৩.

- গাড়ি কই রাখসেন সোহেল ভাই?
- আপা, মেইন রোডে আইসা পড়েন, গলিতে গাড়ি ঢুকাইতে গেলে অনেক সময় লাগবে।
- মেইন রোডে! শাড়ি, হিল পরে এত দূর কেমনে আসবো!
- একটা রিকশা নিয়া আসেন আপা, গলিতে গাড়ি ঢুকাইলে বাসা যাইতে দেরি হবে।

ধুর সাতা। ফোন রেখে গজ গজ করে শিফু।
ক্লান্তিতে পা ভেঙে আসছে, কোমর ব্যথা করছে। সারাদিন হাইহিল পরে হাটাহাটি করায় পায়ের ব্যথা কোমরে উঠে এসেছে।

কোন রিকশা যাবে না এত কাছের মেইন রোডে। অগত্যা হেটেই রওনা দেয়। এত শখের শাড়ি ধুলায় মাখামাখি।

- আজকে ড্রাইভারের খবর আছে। গাড়িতে উঠেই ঝাড়ি দিবো। চাইলেই গাড়ি ভিতরে নিয়ে আসতে পারতো। না, মেইন রোডে পার্কিং করেছে।

মেইন রোডে আসতেই গাড়িটা চোখে পরে শিফুর। রাস্তার অপর পাশে পার্কিং করা। সোহেল ভাই গাড়ির সামনে দাঁড়ানো, শিফুকে দেখেই হাত নেড়ে ইশারা করে।

- আপা এই দিকে। (ইশারা করে ডাকে ড্রাইভার)

আজকে তোমার খবর আছে, গাড়িতে উঠে নেই দাঁড়াও।

মনে মনে গজগজ করতে করতেই রাস্তা পার হচ্ছিলো শিফু। রঙ সাইড থেকে আসা গাড়িটা খেয়াল করেনি সে। গাড়িটা শখের বশে ভার্শিটির কোন ছাত্র চালাচ্ছিল হয়তো। রঙ সাইডে যে আশ্তে চালাবে, জোশের বশে খেয়াল ছিল না তার। গাড়িটা এসে যখন শিফুর গায়ে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল, তখনো শিফুর বিশ্বাস হচ্ছিল না এত সহজে মরে যাওয়া যায়।

মাথা দিয়ে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। সুন্দর মুখটা কেমন বিকৃত লাগছে। এই মুখটার ছবি কত মানুষ তার মোবাইলে তুলে নিয়েছে, কত ফেইসবুক প্রোফাইলে আজ এই মুখটার হাসিমাখা ছবি থাকবে।

সব কিছু মিথ্যা প্রমাণ করে শিফু চলে যাচ্ছে। আর কোন সুযোগ রইলো না ভুলগুলোর জন্য ক্ষমা চেয়ে যাওয়ার, পাপ গুলোর জন্য ইস্তিগফার করার, গুনাহগুলো নেকীতে বদলে নেয়ার।

মৃত্যুর সাথে সাথে আমলের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল শিফুর। তার নেই কোন সাদকায়ে জারিয়া যা মৃত্যুর পরেও তাকে নেকীর সৌভাগ্য দেবে। বরং সে তো সেইসব অভাগাদের দলে, যার মৃত্যুর পরেও গুনাহের খাতা চালু থাকবে।

তার ফেইসবুকের ছবিগুলো রয়ে গেল সব। পরিচিত-অপরিচিত মানুষের মোবাইলের ছবিগুলোও রয়ে গেল। তার পর্দা না করা এই ছবিগুলো যতদিন পরপুরুষদের সামনে পড়বে ততদিন তার গুনাহের ভাগ শিফুর আমলনামায় যুক্ত হতে থাকবে।

শিফু কখনো ভাবেনি মৃত্যু এভাবে আসবে। এত সহজে, এত দ্রুত। ভাবলে হয়ত জীবনটা অন্যভাবে গুছিয়ে নিতো সে। হয়ত ক্ষণিকের এই জীবনের তুচ্ছ হাসি আনন্দের কথা না ভেবে আখিরাতের অনন্তকালের জীবনের জন্য কিছু সঞ্চয় করে রাখতো।

.....

পরিশিষ্ট

মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।

আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

আল কুরআন সূরা নূর

লাভস্টোরি

-উম্ম মারঈয়াম

দেখবে না দেখবে না করেও রিয়েকশন লিস্টে ক্লিক করে ফেলেছে মুন। ঠিক যা ভেবেছিল তা-ই! ৬৫ টা লাইকের পাশে একটা লাভ জ্বলজ্বল করছে।

টানা এক সপ্তাহ ধরে এই লাভস্টোরি চলছে। রাশেদের স্টেটাস, ছবি, শেয়ার সবকিছুতে সায়মা সুলতানার লাভ রিয়েকশন।

যতবার চোখে পড়ে, মূনের মাথায় আগুন ধরে যায়। মনে হয় রাশেদের খাবারে বিষ মিশিয়ে দিতে পারলে শান্তি লাগত!

একটা ডিভোর্সি মহিলা নির্লজ্জের মত বাচ্চার বন্ধুর বাবাকে লাভ দিয়ে যাচ্ছে। এই লাভ কি শুধু মুন একা দেখছে! বউয়ের সাথে ঝগড়া করে দেয়া স্টেটাসে লাভ কে দেয় লোকে কি তা দেখে না?

রাগ কমাতে রাত্রির সাথে শেয়ার করেছিল এই যন্ত্রণার কথা। রাত্রি উলটো বলল তোর হুজুর হুজুরনিরা একটু বেশিই পজেসিভ। সব পোস্টে লাভ দিচ্ছে মানে এই মহিলা লাইক বাটন চিনেই না। এই লাভের কোনো মাহাত্ম্য নেই।

মুন মানতে পারে না। কই মূনের স্টেটাসে তো লাভ দেয় না! লাইকও দেয় না। সিংগেল মাদাররা অনেক ছলাকল্য় পারদর্শী হয়। এটাও সেই কেস নিশ্চিত। আর কাউকে না পেয়ে ওর ভাল মানুষ হুজুরটার পিছু নেয়নি তো?

সুদূর ভার্চুয়াল লাভের প্রতিক্রিয়া এসে গড়ালো খাবার টেবিল পর্যন্ত। অয়নকে অনেক আগেই খাইয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছে। এখন দুজনের খাবার পালা। শুরুটা অন্যান্য দিনের মতই ছিল। কিন্তু ঐ যে ভার্চুয়াল লাভের প্রভাব!

তরকারিতে লবণ বেশি হয়েছে কেন এ প্রশ্নের জবাবে সায়মা সুলতানার অপ্রত্যাশিত অনুপ্রবেশ-

“যাও তোমার সায়মা সুলতানার কাছে যাও! কম লবণে পুষ্টিকর তরকারি রুঁধে খাওয়াবো!”

এরপর আর পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকে না। ভেতরে ভেতরে চমকে গেলেও ঝগড়ায় রাশেদের গলার তেজ কম ছিল না। মুন কি সেদিনের ফেসবুক আলাপচারিতার কথা জেনে গেছে?

জানলেই কী! রাশেদের নিয়ত তো পরিকার। এই অনবরত লাভ বাণে জর্জরিত হয়েই না রাশেদ সায়মাকে নক করেছিল! মেসেঞ্জারে সালাম দিয়ে একদিনের অপেক্ষা। উনি সীন করেছেন ঠিকই, রিপ্লাই দিলেন একদিন পর। সালামের উত্তর পাওয়ার সাথে সাথে রাশেদ কীবোর্ডে ঝড় তুলে বলল “আপু মনে হয় আমার পোস্ট নিয়মিত পড়েন।”

ওপাশ থেকে ধীরে সুস্থে উত্তর এল “জী ভাই সময় পেলে নিউজফীডে সবার পোস্টই পড়া হয়।”
“আপু, আপনি আমার লেখায় লাইক দিলেই তো পারেন!”

“লাভ দিবেন না” কথাটাকে এর থেকে আর মার্জিতভাবে বলা যায় না। সায়মা আপুর আর কোনো উত্তর নেই।

উনি লাভ দিবেন ঠিকই, কিন্তু ইনবক্সে ভাব দেখাবেন। নাকি ফেসবুকের হালচাল বোঝেন না? এরপর থেকে রাশেদের মনে ভীষণ অস্বস্তি। এই স্ক্রীনশটের যুগে কথাগুলো যদি অন্যের হাতে চলে যায়! কে বুঝবে লাইক চাওয়া মানে লাভ না চাওয়া?

মুনের মুখে সায়মা সুলতানার নাম শুনে রাশেদের রাতের ঘুম হারাম। অনেকক্ষণ বিছানায় এপাশ ওপাশ শেষে ওর মনে হলো ভুল বোঝাবুঝির অবসান হওয়া দরকার। মুনও ঘুমায়নি। অয়নের ক্লাসমেটের মা সায়মা সুলতানা তার ঘুমেও বাদ সেধেছে।

রাশেদ যথাসম্ভব স্বাভাবিক গলায়ই জানতে চেয়েছিল এই মহিলা কীভাবে ওদের সাংসারিক জীবনে ঢুকে গেল। মুন স্বাভাবিক থাকতে পারল না। এত লাভের পরও এই মহিলা সংসারে ঢুকবে না! বরং রাশেদের নির্লিপ্ততাই বিস্ময়কর। লাভের নোটিফিকেশন কি ও পায় না?

- সায়মা সুলতানা লাভ দিলে আমি কী করতে পারি? আমার কী দোষ?
- ঠিক আছে। তোমার যখন দোষ নেই, তাহলে আমি ঐ মহিলার সাথে কথা বলব। বলে দিব যাতে আর লাভ না দেয়।
- পাগল তুমি! কোনো দরকার নেই কথা বলার!

ব্যস! সন্দেহ কাটাতে গিয়ে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হল। দুজনের রাতের ঘুম ওরা তুলে দিল সায়মা সুলতানার হাতে।

দুঃখ কষ্ট অনেকটাই ফেসবুককেন্দ্রিক হয়ে গেছে বলে মুন ঐ মাঝরাতেই বিরাট বজ্রতা দিল ফেসবুক মধ্যে। বজ্রতার বিষয়বস্তু স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য।

আর রাশেদ ব্যাটম্যানের ছবিটা বদলে শশ্রমভিত্তি নুরানী চেহারাটা প্রোফাইল পিকচারে ঝুলিয়ে দিল। এটা পুরাতন অস্ত্র। প্রোফাইলে হুজুরের ছবি মুন একেবারেই মানতে পারে না! আজকালকার মেয়েদের উপর বিশ্বাস নেই ওর।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্যে রাশেদ গা করল না। কিন্তু রাশেদের প্রোফাইল পিকচারে মুন জ্বলে পুড়ে ছাই।

একদিন, দুইদিন, তিনদিন গেল। রাশেদের ছবিতে “তেনার” লাভ নেই। এমনকি কোনো পোস্টেও লাভ নেই।

মুনের হালকা পাতলা রাগ অভিমানে মেশানো সন্দেহ এখন আতংকে রূপ নিয়েছে। এ আতংকে কোনো খাদ নেই। তবে কি গোপনে ভালবাসার আদান প্রদান চলছে?

এখন পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়ার অবস্থাও নেই। রাশেদ সকালে অফিসে গিয়ে রাতে ফেরে। দু’জনের কথা হয় না। মুন সারাদিন ঘরেই থাকে। বাইরে যাওয়া বলতে অয়নকে স্কুল থেকে আনা নেয়া।

ফেরার পথে দূর থেকে কয়েকবার সাইমাকে দেখে অন্তর আত্মায় আগুন ধরে যায় মুনের। পারিবারিক শিক্ষা ভব্যতা সভ্যতা জলাঞ্জলি দিয়ে খুব বলতে ইচ্ছে করে তোর জন্যে আমার সংসারের আজ এ অবস্থা! বলা হয় না। অতটা নিচে নামতে পারবে না। তবে সুযোগ পেলে একদিন কিছু না কিছু একটা বলবেই সে!

সুযোগ আসতে দেরি লাগল না। একদিন অয়নকে নিয়ে ফেরার পথে জায়েদ দৌড়ে এল ওর সামনে। পেছন পেছন তার মা সাইমা সুলতানাও দৌড় দিয়েছে।

“আন্তি আন্তি আমি রাশেদ আংকেলের উপর ভীষম রাগ করেছি।”

মুন স্তম্ভিত। এখন কি এই ক্লাস ওয়ানের বাচ্চাকেও আংকেলের পেছনে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে! অন্য কোনো বাচ্চা হলে ভীষণ শব্দে হেসে কুটিকুটি হয়ে যেত মুন। কিন্তু মা-ছেলের যৌথ প্রযোজনার চক্রান্তে হাসির কিছু নেই।

জায়েদ আবার বলতে শুরু করল “আংকেলের ব্যাটম্যানের ছবিটা ফেসবুকে নেই কেন? আমি ব্যাটম্যান দেখলেই লাভ দেই। দেখলেই লাভ....”

কথা শেষ হওয়ার আগেই ঠাস করে একটা চড়। এলোপাতাড়ি মারের সাথে অসহায় সিংগেল মাদারের কান্না- তুই আবার আমার ফেসবুক ধরেছিস? আবার!

ঘটনার আকস্মিকতায় মুন বরফের মত জমে গেছে। লাভ স্টোরিটা একটা অবুঝ শিশুর একক প্রযোজনা ছিল।

আহারে অবুঝ বাচ্চাটা! আহারে !!

.....

বাবু তো ছোট সাকিবা আহমেদ

সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে, বাবা মায়ের কাছে তারা দীর্ঘদিন যাবত ছোট বাবুই রয়ে যায়। আর সেটা যদি হয় একমাত্র সন্তান তাহলে তো কথাই নেই। সেই বাবু যে কবে বড় হয়!

মেয়েদের তাও শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার উসিলায় কিছু কাজ শেখানো হয়। যাদের শেখানো হয় না তারাও বিয়ের পর শিখে নেয়। কিন্তু আমাদের দেশে ছেলেদের জন্য ছোটবেলা থেকে সংসার শুরু করার পরেও কাজকর্মের ব্যাপারে থাকে বিশেষ ছাড়। ছেলেদের জন্য তাই মায়েরও চিন্তার শেষ থাকে না। থাকে কাজ না করতে দেওয়ার নানা অজুহাত।

“বাবু তো এখন ছোট, মাত্র ৫ বছর। নিজে নিজে খেতে পারবে না তাই আমি খাইয়ে দেই।”

“বাবু তো এখন ছোট, মাত্র ৮ বছর। ও কী খেলনা গোছাতে পারবে নাকি?”

“বাবু তো এখন ছোট, মাত্র ১০ বছর। সকালে উঠতে অনেক কষ্ট হয়, তাই ফযর পড়তে দিই না। একটা ভাল ট্যাবও কেনা দরকার, পাশের বাসার সুজনের বিশাল ট্যাব দেখে ছেলেটার আমার খুব মন খারাপ হয়!”

“বাবু তো এখন, ছোট মাত্র ১২ বছর। কী কাজ করবে এখন?”

“বাবু তো এখন ছোট, মাত্র ১৫ বছর। ঘর গোছানোর ও কী বোঝে?”

“বাবু তো মাত্র কলেজে উঠলো, এখন একটা দামী মোবাইল না হলে চলে?”

“বাবু তো মাত্র ভার্শিটি তে পা রাখলো এখনই কিসের ইনকাম?”

“বাবুর তো মাত্র ২৩, এখন বাজার করতে পারবে না। আমরা আছি না?”

“বাবুর মাত্র ৩০ হল, টাকা-পয়সা জমি-জমা কিছুই করতে পারেনি, এখনই বিয়ে!”

সে সব বাবুরা একটা সময় নিজেকে আবিষ্কার করে অলস এবং পরনির্ভরশীল হিসেবে। তখন ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মন মানসিকতা এবং পরবর্তীতে সময় সুযোগের অভাবে আর পরিবর্তন আনাটা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না।

আচ্ছা এতে করে বাবুরা কী একলাই সাফার করে? না, সবচেয়ে বেশি সাফার করে বাবুদের সহধর্মিণীরা এবং মাঝে মাঝে মুখে প্রকাশ না করলেও বাবা মা নিজেরাও ভুক্তভোগী হয়ে থাকেন।

আল্লাহর উত্তম নিয়ামত সন্তানদেরকে ঘরে বাবু বানিয়ে রেখে কী লাভ হচ্ছে?

১। বাবা মা অসুস্থ হলে ছেলেরা সেবা করতে পারছে না। বঞ্চিত হচ্ছে অনেক বিশাল একটি ইবাদত থেকে। কারন তাদের কে শেখানোই হয়নি এই সময় কীভাবে তারা কী করবে?

– এ জন্য ছোটকাল থেকে বাবা মা অসুস্থ হলে তাদের সেবা করা সম্পর্কে হাদিস শোনাতে হবে, কীভাবে ছোট ছোট কাজের মাধ্যমেও সেবা করা যেতে পারে সেসব জানাতে হবে। যেমন, মাথা টিপে দেওয়া, শরবত বানিয়ে খাওয়ানো ইত্যাদি।

২. মা অসুস্থ মানে রান্না বান্না ঘরবাড়ির যাচ্ছেতাই অবস্থা হয়ে থাকে। কারন পুত্র সন্তানরা জানেন না এগুলো কিভাবে ম্যানেজ করতে হয়।

– ছেলে শিশু কথা বলা শিখলেই তাকে দিয়ে ছোট খাটো কাজগুলো করা শিখিয়ে ফেলতে হবে। যেমন, নিজের খেলনা জায়গামত রাখা, নিজের কাপড় নিজের ড্রয়ারে রাখা ইত্যাদি।

৩. মা অসুস্থ মানে ছেলেরা না খেয়ে বসে থাকে, কখন মা তার সর্বোচ্চ শক্তি সঞ্চয় করে বিছানা থেকে উঠে তাদের খাবার বেড়ে দিবেন! অথচ সেই সময় সন্তানদেরই উচিৎ মায়ের মুখে খাবার তুলে দেওয়া।

– ১০ বছর বয়স থেকে ছেলেদের নিজের নাস্তা নিজে বানিয়ে খাওয়া শেখাতে হবে, সেই সাথে খাবার বেড়ে খাওয়া এবং খাওয়া শেষে থালাবাসন জায়গামত রাখার মত হালকা পাতলা কাজগুলিও শেখাতে হবে।

৪. মা বোনদের ঘরের সব কাজ করতে দেখে বড় হওয়া ছেলেটির মাইন্ড সেট হয়ে যায় যে ঘরের কাজ সব মেয়েদেরই দায়িত্ব! যেটা মোটেও সুন্নাতসম্মত না। আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে নিজের কাজ নিজে করতেন।

* রাসূল. সা. এর সীরাহ দ্রষ্টব্য।

– এসব ব্যাপারে ক্লিয়ার হওয়ার জন্য ছোট থেকেই বাচ্চাদেরকে রাসূলের সা. সীরাহ পড়ে শোনাতে হবে। উনার আচার আচরণ, কথা বার্তা, কাজ কর্ম সম্পর্কে সব কিছু জানাতে হবে।

৫. বিয়ের পর একটা মেয়ে অকাল সমুদ্রে এসে পড়ে। নতুন মানুষ নতুন বাসা নতুন অভ্যাস। এর উপর তার কাছ থেকে আশা করা হয় সে এক হাতে দশ হাতের কাজ সেড়ে ফেলবে কোন টু শব্দ ছাড়া। রান্না বান্না, সংসার সামলানো, বাচ্চা পালা, অতিথি আপ্যায়ন, আত্মীয়তা রক্ষা, দ্বীন শিক্ষা, পড়াশোনা (অপশনাল!), আবার ক্ষেত্র বিশেষে চাকরি ও করা! মেয়ে কারো সাথে মিশতে পারছে না, মুখ গোমড়া করে রাখে ইত্যাদি সমস্যা তো থাকেই !

– এসব সমস্যার সমাধানে বিয়ের আগেই ছেলেকে বিয়ের ব্যাপারে একটা ধারণা দেওয়া বাবা মায়ের কর্তব্য। একটা মেয়েকে কিভাবে ট্রিট করতে হবে সেটা ছেলেরা যতটা না পড়ে শেখে তার চেয়ে বেশি দেখে শেখে। এই ব্যাপারে তাই বাড়ির কর্তাকে সব সময় বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হবে।

মেয়েরা ঘর সংসার সামলাবে এটাই তাদের দায়িত্ব। কিন্তু তারা কি একটা সাহায্যের হাত আশা করতে পারে না? রান্না, বাচ্চার কান্না এবং অতিথি আপ্যায়ন নিয়ে যখন সে হিমশিম খাবে তখন অপরপক্ষ কী এক গ্লাস পানি ঢেলে খেতে পারবেন না ?! দিন শেষে ক্লান্ত শরীর নিয়ে যখন সে ঘরে আসবে তখন বিছানাটা গোছানো কী সে দেখতে পারেনা? প্রতি রাতে মশারি টাংগানো নিয়ে মনমালিন্য করাটা কী খুব জরুরি? দিন শেষে একটা হাত কী তার মাথায় রেখে বলা যায় না, আজকে অনেক কষ্ট করেছো তুমি?

বিশ্বাস করুন, মেয়েরা এর চেয়ে খুব বেশি কিছু স্বামীর কাছে আশা করেনা।

রাসূল সা. এর যুগে যদি ছেলে সন্তানদের “বাবু” বানিয়েই রাখা হতো তবে উসামা বিন যায়েদ সতেরো বছর বয়সে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে পারতেন কী? যে কোন ধরনের কাজই হোক না কেন সেটাতে নেতৃত্ব দেওয়া মানে তার সেই পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব থাকাটা জরুরি। আজকে কয়টা ঘরে আমরা সতেরো বছর বয়সী শক্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ মানুষ খুঁজে পাবো?

অল্প বয়সে হাতে ট্যাব, দামী মোবাইল, ল্যাপটপ ইত্যাদি তুলে দিয়ে আসলে কী আমরা তাদের উপকার করছি নাকি ক্ষতি করছি? খুব ছোট থেকেই মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদেরকেও তাদের সঠিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করাটা জরুরি। কলেজ পড়ুয়া

ছেলেদের কে টিউশনি করে নিজের পকেট খরচ চালানোর জন্যেও তৈরি হতে বলাটাও তাদের স্বাবলম্বী করে তোলার প্রথম ধাপ হতে পারে।

আল্লাহ্ সন্তানকে আমাদের কাছে আমানত হিসেবে দিয়েছেন। আমাদের দায়িত্ব তাদেরকে সঠিক পথে চলার শিক্ষা দান করা, স্বনির্ভরশীল এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা। ছেলেদেরকে এই শিক্ষা গুলো দেওয়ার মাধ্যমে আমরা শুধু যে তাদের উপকার করছি তা না, আমাদের সাদকায়ে যারিয়ার পথ সহজ করছি এবং অন্য আরেকটি মেয়ের প্রতিও ইহসান করছি! সুবহানআল্লাহ্! আল্লাহ্ নিশ্চয় এর উত্তম প্রতিদান প্রতিটি মাকে দিবেন যারা অন্য আরেকজন মুসলিমের কষ্ট সহজ করতে কাজ করে যাবেন, ইন শা আল্লাহ!

পরিশেষে বলতে চাই, আমাদের মায়েদের মনে সন্তানরা আজীবন হয়তো বাবুই হয়ে থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা ভুলে গেলে তো চলবে না আমাদের, তাই না? বাস্তব জীবনে আমাদের সন্তানরা যেন প্রতিনিয়ত ধাক্কা না খায় সেদিকটাও মাথায় রাখতে হবে!

আমরা যেন আমাদের সন্তানদের উত্তম চরিত্রের মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে পারি, তাদের হাক্ক আদায়ে সচেতন থাকতে পারি এবং ছেলের সহধর্মিণীর প্রতিও ইহসান করে যেতে পারি! আল্লাহ্ আমাদের সকল মায়েদের সেই তৌফিক দিন। আমীন।

মূলগায়ন

রেহনুমা বিনতে আনিস

স্ত্রী বিগত হবার পর এক ব্যক্তি দুঃখ প্রকাশ করছিলেন, ‘আহা! ওর সাথে কত সময় কত রাগারাগি, কত দুর্ব্যবহার করেছি! কত সময় সে আমার জন্য কতকিছু করেছে, অথচ আমি কোন অ্যাপ্রিশিয়েশন দেখাইনি! এখন আমি এসব খুব অনুভব করি। কিন্তু সে বেচারী তো জানতেও পারলনা আমি আসলে তাকে কতখানি ভালবাসতাম। এই মূহূর্তে হয়ত সে আল্লাহর সামনে আমার নামে নালিশের ফিরিস্তি নিয়ে বসে আছে!’

এমন আফসোস অনেকেই করে থাকেন। যেমন স্বামীকে তালাক দিয়ে চলে যাবার বিশ বছর পর এক ভদ্রমহিলা অনুশোচনা করে বলছিলেন, ‘তখন বয়স কম ছিল। রাগের মাথায় তালাক দিয়ে চলে এসেছিলাম। কিন্তু এতে করে যে কেবল ওর ক্ষতি হয়েছে তা নয়, আমার জীবনটাও এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। ছেলেমেয়েদের গড়ে তোলার জন্য বাবা বা মা কেউ এককভাবে যথেষ্ট নয়। আমার সর্বাঙ্গিক চেষ্টা সত্ত্বেও আমি আমার ছেলেমেয়েদের কাঙ্ক্ষিতভাবে মানুষ করতে পারিনি। আমার জেদ বিজয়ী হয়েছে, কিন্তু আমার সন্তানগুলোর জীবন তছনছ হয়ে গিয়েছে। সেদিন যদি আমার আজকের মত মানসিক পরিপক্বতা থাকত, তাহলে আমি আমার সংসারটাকে বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ করতাম’।

পরিণত বয়সী এক ভদ্রমহিলা। স্বামী সন্তান নিয়ে গুছানো সংসার। কিন্তু পরম সুখের মূহূর্তগুলোতেও তিনি হঠাত হঠাত আনমনা হয়ে যান, বিষম্বতায় ভোগেন। কারণ তিনি সার্বক্ষণিক একটা মৃত্যুকে বয়ে নিয়ে বেড়ান। নিজেকে দায়ী করেন, ‘আমি যদি একটু সচেতন হতাম, হয়ত আজ সে জীবিত থাকত। হয়ত তার একটা চমতকার সংসার থাকত, একটা ফুটফুটে বৌ থাকত, তিন চারটা বাচ্চাকাচ্চা থাকত!’ কিন্তু কিছু কিছু আক্ষেপের কোন প্রতিকার থাকেনা। তাঁরও নেই। কিশোরী বয়সে যখন তিনি পর্দা করতেন না তখন এক ছেলে তাঁর প্রেমে পড়ে যায়। প্রেম নিবেদন করায় তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন, সবার সামনে তাকে অপদস্থ করেন। অপমানের জ্বালা সইতে না পেরে ছেলেটি পরদিন আত্মহত্যা করে বসে। তিনি আজও ভাবেন, যদি সে সময় তিনি পর্দা করতেন, সিগনাল দিতেন, ‘I am not available’, হয়ত ছেলেটি তাঁর দিকে তাকাতও না, প্রেম নিবেদনের প্রশ্নও আসতনা, তিনি কটু কথা বলে ঝাল

ঝাড়তেন না, ছেলেটি সুইসাইড করতনা, তিনি এই অপরাধবোধ আজীবন বয়ে বেড়াতে বাধ্য হতেন না। কিন্তু মাঝে মাঝে চোর পালালে যখন বুদ্ধি বাড়ে তখন আর হত সম্পদ ফিরে পাবার কোন উপায় থাকেনা।

এক মূহূর্ত রাগ সংবরণ করতে না পারার ফলে কত সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়, মনের ঝাল ঝাড়তে পারার আনন্দ কিছুতেই সেই বিচ্ছেদের বেদনা নিবারণ করতে পারেনা। একটা ‘ধন্যবাদ’ কিংবা একটু মৃদু হাসি দিতে কার্পণ্য করার কারণে কত আশা ভালোবাসার ফুল কুঁড়িতেই ঝরে যায়, শত উপহার উপঢৌকনে সেই না পাওয়ার কষ্ট মুছে দেয়া যায়না। কত হৃদয়বিদারক কথা ক্ষোভের মূহূর্তে বাক্যবাণ হয়ে বেরিয়ে যায়, যে ক্ষত পরে আর কোন মলম দিয়ে সারানো যায়না। কত অবুঝ আচরণ সারাজীবনের জন্য দুঃস্থল বনে যায়, যার কোন প্রতিকার করা যায়না।

হুম, জানি, আমরা সবাই ভুল করি। বুঝবোনা কেন ভাই, আমি নিজে কি সেই পথ পাড়ি দিয়ে আসিনি? মানসিক পরিপক্বতা যে বয়সে আসে তার আগে অপরিণত অবস্থাতেই আমরা জীবনের অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে ফেলি। সেই পথ যেমন পদে পদে কন্টকাকীর্ণ তেমনই বিপদসংকুল। সে বয়সে সবারই মনে হয় শুনিয়ে দেয়া, দেখিয়ে দেয়া, নিজেকে জাহির করা এক বিরাট কৃতিত্বের ব্যাপার। এখানেই নিজের মনের চাকায় ঈমানের ব্রেক লাগানোর প্রয়োজন পড়ে। কারণ, একজন মানুষের মাঝে অপরিণামদর্শিতা থাকতে পারে। আবেগের সামনে বিবেকের ব্রেক ফেল করতে পারে। কিন্তু যার ঈমান আছে তাঁর নিজেকে প্রতিরোধ করার জন্য ‘আমি আল্লাহর সামনে কি জবাব দেব?’-এর চেয়ে ভাল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আর নেই। কারণ, আমাদের সম্পর্কগুলো তো আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম! এগুলোর প্রত্যেকটির হক আদায় করার ব্যাপারে আমাদের আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং প্রতিটি সম্পর্কের স্বরূপ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সম্পর্কগুলোর দাবী বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এগুলোর সীমারেখাগুলোও অংকন করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, এই কাজগুলো সহজ কিংবা মসৃণ হবে মনে করার কোন কারণ নেই। কিন্তু পরীক্ষা সহজ হলে কি পাশ করায় কোন কৃতিত্ব থাকে? সম্পর্কগুলো জিইয়ে রাখার জন্য হয়ত কখনো আমাদের নিজেদের, কখনো অন্যদের ঘষামাজা করার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু সেটা কিভাবে এবং কতটুকু হবে তার জন্যও নীতিমালা দিয়ে দেয়া হয়েছে।

আমাদের প্রত্যেকের অবস্থান আমাদের জন্য একটি পরীক্ষা। আমার অবস্থানে আমি হয়ত অপর কোন ব্যক্তির সাথে অযাচিত আচরণ করতে পারি, তবে তার মূল্য দেয়ার জন্য আমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। নতুবা ন্যায়সঙ্গত আচরণ করার জন্য সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। আমার আচরণ সঠিক হচ্ছে কিনা তা নিরূপণ করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হোল সেই ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর প্রতি আমার ব্যবহার যাচাই করার চেষ্টা করা। কাজটি নিঃসন্দেহে কঠিন, কারণ আমাদের মন কেবল অন্যের ত্রুটিগুলো দেখে, নিজেরগুলো কিভাবে যেন দৃষ্টিগোচর হয়না। কিন্তু চর্চা করলে এই বোধ নিজের মাঝে গড়ে তোলা অসম্ভব নয়। কারণ অতিরিক্ত অনুভূতিপ্রবণ লোকজন ব্যাতিরেকে সাধারণত সব মানুষ একই ধরনের আচরণে আনন্দিত হয় কিংবা কষ্ট পায়।

আবস্থিতভাবে কাউকে আঘাত দিয়ে ফেলা থেকে বিরত থাকার সবচেয়ে সহজ উপায়ঃ ‘ভাবিয়া করিয়ো কাজ করিয়া ভাবিওনা’। যেকোন অবস্থায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার পরিবর্তে খানিক সময় নিয়ে চিন্তাভাবনা করে কথা বললে বা কাজ করলে অসাধনতাবশত অপরের কষ্টের কারণ হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। আমাদের সমাজে, যেখানে ভদ্রতাকে দুর্বলতা হিসেবে দেখা হয়, হয়ত আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণকে কমজোরী হিসেবে দেখা হতে পারে, জনসমক্ষে আপনার ইমেজ হয়ে হতে পারে। কিন্তু যে কঠিন মুহূর্তে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাঁর ইমেজ আল্লাহর কাছে অনেক উচ্চ স্থান পায়। কারণ তিনিই বলেছেনঃ

‘রাহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা কর এবং মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলতে থাকলে বলে দেয়, ‘তোমাদের সালাম’ (সুরা ফুরক্কানঃ আয়াত ৩৩)।

আবার তিনিই উল্লেখ করেছেনঃ

‘আর মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলো না, পৃথিবীর বুকে উদ্ধত ভঙ্গিতে চলো না, আল্লাহ পছন্দ করেন না আত্মশ্রী ও অহংকারীকে। নিজের চলনে ভারসাম্য আনো এবং নিজের আওয়াজ নীচু করো। সব আওয়াজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে গাধার আওয়াজ’ (সুরা লুকমানঃ আয়াত ১৮-১৯)।

সুতরাং, যতই কঠিন মনে হোকনা কেন, অপরের সাথে সেই আচরণ করাই সঙ্গত যে ব্যবহার আমরা নিজেরা অপরের কাছে পেতে চাই। একইভাবে অপরের প্রতি সেই ব্যবহার বর্জনীয় যা আমাদের কষ্ট দেয়।

তখন প্রশ্ন আসে, তাহলে কি আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখাব না? হুম, সেখানে চুপ থাকলে আবার আমরা আল্লাহর কাছে আটকে যাব। প্রতিক্রিয়া দেখাতেই হবে। তবে কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাব সে ব্যাপারে কিছু নীতিমালা দিয়ে দেয়া হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন শুধু নির্যাতিত ব্যক্তিকে নয়, নির্যাতনকারীকেও সাহায্য করতে। কারণ, তাঁর এই আচরণ তাঁকে শান্তির জন্য নির্ধারিত করে ফেলেছে অথচ তিনি তা বুঝতে পারছেন না। তবে আমরা নির্যাতিত ব্যক্তিকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেই, কিংবা নির্যাতনকারীকে আত্মনিয়ন্ত্রণের উপদেশ দেই, পদ্ধতি একই। প্রথমে সেই ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝানোর উদ্যোগ নিতে হবে। তাঁকে নিয়ে আড়ালে বসতে হবে যেন তিনি অপরের সামনে লজ্জা না পান। তাঁর মুখোমুখি বসে, তাঁর চোখে চোখ রেখে, সম্ভব হলে তাঁর হাতে হাত রেখে, চেহারায়ে আন্তরিকতা মেখে, কণ্ঠে আন্তরিকতা ঢেলে, বার বার প্রিয় সম্বোধনে সম্ভাষণ করে তাঁকে নিজের আন্তরিকতার ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে হবে। কোন পর্যায়ে তাঁকে অভিযুক্ত করে বা হেয় করে কথা বলা যাবেনা। মনে রাখতে হবে, আমার আচরণ বা কথা যদি ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পর্যায়ে নিয়ে যায় তাহলে আমি ব্যর্থ হয়েছি। কারণ একজন মানুষ যখন defensive mode-এ চলে যায় তখন সে আর আপনার কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত কিংবা ইচ্ছুক থাকেনা। কিন্তু আপনি যদি আন্তরিকতা দিয়ে তাঁকে বুঝাতে পারেন আপনি কথাগুলো কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে নয় বরং তাঁর কল্যাণ কামনায় বলছেন, সেক্ষেত্রে মানুষ অনেক তিক্ত কথাও সহজভাবে গ্রহণ করে পারে।

সবচেয়ে বড় কথা, মানুষকে মূল্যায়ন করতে শিখতে হবে। কোন মানুষই পারফেক্ট হয়না। আমিও না। এমনকি বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও বিশ্বাস করুন, আপনিও না। সুতরাং, মানুষের মাঝে ত্রুটির অনুসন্ধান করলে আপনি ত্রুটির অভাব পাবেন না। কিন্তু গুণের অনুসন্ধান করলেও আপনি নিরাশ হবেন না। আমরা যদি অপরের ত্রুটির পরিবর্তে ভালো গুণের ওপর ফোকাস করি এতে নানাবিধ লাভ। প্রথমত, আমরা তাঁর উদাহরণ থেকে কিছু শিক্ষা লাভ করতে পারি। দ্বিতীয়ত, তাঁকে অ্যাপ্রিশিয়েট করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। তৃতীয়ত, আমরা একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। এতে নিজেও শান্তিতে থাকা যায়, অপরেরও অশান্তির কারণ হতে হয়না।

রাসূল (সা) শিখিয়েছেন অ্যাপ্রিশিয়েট করার পাশাপাশি তা প্রকাশ করতে। কারণ আমরা কেউ মানসবেত্তা নই যে কারো মুখ দেখে বলে দেব সে কি ভাবছে। অবশ্য আমার ধারণা এতে ভুলই হয়েছে, কারণ আমাদের ভাবনাগুলো মাঝে মাঝে ভয়ংকর হতে পারে। সে যাই হোক, আমরা অপরের অনুমতি ব্যতিরেকে তাদের মনের ভেতর প্রবেশ করতে পারিনা বিধায় আমাদের আশেপাশের লোকজনকে আমাদের জানানো প্রয়োজন আমরা তাদের কতখানি ভালবাসি, কতখানি অ্যাপ্রিশিয়েট করি, তাদের আচরণগুলো আমাদের কতখানি আনন্দ দেয় বা ব্যাথা। অধিকাংশ ভুল বুঝাবুঝির উৎস communication-এর অভাব, কোন যুক্তি ছাড়াই ধরে নেয়া যে অপর ব্যক্তি বুঝে নেবে আমি কি চাই বা আমি কি অনুভব করছি। আপনি যদি কারো ব্যপারে মায়া পোষণ করেন তবে কেন বলার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে এমন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করতে চান? এ’ কেমন ভালোবাসা যা ভালোবাসাকেই ধ্বংস করে দেয়?

সুতরাং, পরবর্তীতে হা হুতাশ করার পরিবর্তে সময় থাকতেই নিজের মনের ভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে শিখুন। প্রয়োজন না হলে রাগারাগি করা থেকে বিরত থাকুন। প্রয়োজন হলে বলার আগেই ভাবুন কি বলছেন কেন বলছেন, কিভাবে বলছেন, যে উদ্দেশ্যে বলছেন তা স্পষ্ট হবার মত করে বলছেন কিনা। ‘Please’, ‘ধন্যবাদ’, ‘দুঃখিত’ এই ধরনের শব্দগুলো আপনার প্রতিদিনের vocabulary-র অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নিন। চেহারা হাসি রাখুন। আপনার আশেপাশের মানুষগুলোকে বুঝতে দিন তারা আপনার জীবনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। হয়ত দেখবেন আপনার জীবনে হঠাত করে বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষীর সয়লাব হয়ে যাবে যারা আগে আপনার কাছে ভিড়তে সাহস পেতনা।

সাবরুন জামীল

নিশাত তামিম

বড়াপু বাচ্চাদের নিয়ে বেড়াতে এসেছে দুদিন হলো, ছোট্ট দাঁড়িয়ে দেখছে, আপুটা সকাল থেকে বড় বাচ্চাটাকে খাওয়ানো নিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছে, একবার এটা রান্না করছে, আরেকবার ওটা কিনে আনছে, কিছুতেই খাবেনা। ছোট্টটা একটু পর পর কান্নাকাটির এপিসোড চালিয়ে যাচ্ছে। মায়ের চোখে ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, বাকিরা দেখতে দেখতেও ক্লান্ত।

ছোট্ট সন্তানসম্ভবা, বাচ্চা মানুষ করার অভ্যেস এখনো হয়নি। প্রেগন্যান্সির বয়স তিন মাস পেরিয়ে চার মাসে পড়লো। ভেবেছিলো, মায়ের মত ওরও পেটের বাচ্চা নিয়ে তেমন কষ্ট হবেনা। কিন্তু সে হিসেব মেলেনি, দুটো মাস প্রতিটা দিন গুণে গুণে পার করেছে, কষ্টের দিন আর শেষ হয়না! কিছু সিম্পটম কাটছে, আবার নতুন কিছু শুরু হচ্ছে, ‘একটার পর একটা কষ্ট!’ অসীম ধৈর্যের প্রতীক এই বড়াপুটার দিকে তাকিয়ে আজকাল ও একটা কথাই ভাবছে,

“প্রতিটি নি’আমত কতখানি মূল্য দিয়ে কিনতে হয়! ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া খুব কঠিন, আর পায়ের নিচে জাল্লাত ধারণ করার মূল্য একটু বেশিই কঠিন! তার জন্য অনেকটা পথ বাকি....”

মেজো বোনটা চুপচাপ, শান্ত স্বভাবের। একবার বড়াপুর বাচ্চাটাকে থামায়, আরেকবার মায়ের কাজে গিয়ে হেল্প করে। সবসময় বেশ হাসিখুশি, দেখে বোঝাই যাবেনা ভেতরে কতখানি কষ্ট। ছোট্ট যখন কাল মাঝরাতে পেট ব্যথায় ঘুম ভেঙে ওয়াশরুমে যাচ্ছিলো, মেজোর রুমের ডিমলাইটের আলো আর ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পেরেছিলো, আপু তাহাজ্জুদের সিজদায় কাঁদছে। মনটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। মেজোর অনেক শখ ছিলো- অনেকগুলো বাচ্চাকাচ্চার মা হবে কেউ হাফেজ হবে, কেউ আলেম, কেউ মুজাহিদ, মুজতাহিদ...কত স্বপ্ন তার! কে জানে, কি এক অজানা কারণে আজ পাচ বছর হলো ওর বাচ্চাকাচ্চা হয়না। আর দশটা শ্বশুরবাড়ির মত ওকে বেশি কথা শুনতে না হলেও এর ওর কান কথা তো না শুনে পারা যায়না, তাই মায়ের কাছেই বেশি থাকা পড়ে। কারও বাচ্চা দেখলেই ওর মন খারাপ হয়ে যায়, কিন্তু অদ্ভুতভাবে এই অনুভূতিটা লুকিয়ে রাখতে পারে ও।

“আচ্ছা, সবরের কষ্টটা কার বেশি? ছোট্টর না মেজোর? না বড়াপুর?”

মাঝরাতিরের ঘুমঘুম চোখে হিসেব মেলানো পারেনি সে: আসলে আল্লাহ কাউকে নি’আমত দিয়ে পরীক্ষা করেন, কাউকে না দিয়ে, পরীক্ষার কাঠিন্য নির্ণয়ের মাপকাঠি মানুষের কাছে নেই, তবে তারতম্য অনুযায়ী ফলাফল প্রদানের আশ্বাসটুকু পূর্ণমাত্রায় আছে রাক্বের করীমের কাছে, বিশ্বাসীর জন্য এটুকুই প্রশান্তির। ভাবনার ছেদ পড়ে গিয়েছিলো বড়াপুর ছোট ছেলে মুস’আবের কান্নার শব্দে। সুবহানাআল্লাহ! আপু পারেও, ও

হলে মনে হয় ফেলেটেলে চলে যেতো কোথাও। বাথরুম সেরে আর ঘুমের বিছানায় মন টানেনি। রাত তখন সোয়া তিনটে, ও অসুস্থ হলেও এখনো বাচ্চাটা দুনিয়ায় আসেনি, সারারাত কেউ ওকে জ্বালায়না, কিংবা মেজোর মত নি'আমত বঞ্চিতও ওকে করেননি আল্লাহ, জায়নামাজের জমিন তো ওর জন্যই, চোখে যখন পানি চলেই এসেছে, সঠিক জায়গায় ফেললেই হয়,

“ইয়া আল্লাহ! আমার ধৈর্য বাড়িয়ে দিন, আমার উপর আপনার পরীক্ষা সহজ করুন যাতে ধৈর্য হারিয়ে না ফেলি। মেজো আপুকে একটা সংকর্মশীল সন্তান দান করুন.....”

ছোটবেলা থেকেই জীবন ও জগত নিয়ে এই চিন্তেভাবনার জন্যই ছোট্ট একটু বেখেয়ালি প্রকৃতির। এরই মধ্যে মা খাবার জন্য ডেকে গেছেন, খেয়ালই করেনি। মনে পড়তেই মায়ের রুমে ছুট। ওদের মা আরেক দিলদরদি মানুষ। বাবা মারা যাওয়ার পর দুমেয়ে নিয়েই তার সংসার, বড় মেয়েটা দূরে থাকলেও মাকে দেখতে সুযোগ পেলেই ছুটে আসে। সংসারের দেখভাল করার পাশাপাশি মা একটু সময় সুযোগ পেলেই কারো একটি উপকার করছেন, তো কাউকে দুটো ভালো কথা বলছেন, পাড়ার আন্টিদের কোরআন পড়া শেখাচ্ছেন, কারও মেয়ের বিয়ের ঘটকালি করছেন: এ পাড়ায় তার খাতিরের লোকের তাই অভাব নেই। এই মুহুর্তে মা'র পাশে মেজোর সমবয়সী এক মেয়ে বসে আছে মনমরা হয়ে। সাথেই তার ষাটোর্ধ মা, কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন,

“আপা জানেন? মেয়েটার বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে, ভালো ছেলে পাওয়া যাচ্ছেনা। প্রস্তাব যা-ও আসে, কিভাবে কিভাবে যেন শেষপর্যন্ত না হয়ে যায়। এত ভালো একটা মেয়ে, এত ভালো রেজাল্ট, অথচ ওর চিন্তায় আমার, ওর বাবার ঘুম হয়না রাতে....”

ছোট্ট আর নিতে পারেনা, বমিভাবটা দমকে আসে, এক টুকরো আদা খেতে হবে এক্ষণই, নয়তো বমি হয়ে যাবে। রান্নাঘরের দিকে দৌড় দেয়। আদার টুকরো মুখে নিয়ে বমিভাবটা কমে আসে আর মাথায় অবিবাহিত মেয়েটির চিন্তা-কল্পনা খেলে যায়, “আহা! এ বাড়ির মেয়েরা কত সূকুনের মাঝে আছে, প্রত্যেকের একটা শেল্টার আছে, সমাজে পরিচয় দেয়ার মত, মনের কথা বলবার মত একটা স্বামী আছে, অথচ আমার বিয়েটাই হচ্ছেনা। আচ্ছা, আমার জন্য কি আদৌ কোন পাত্র বরাদ্দ আছে? আচ্ছা, বিয়েটা যদি না-ই হয়, কী হবে তাহলে? লোকে কী বলবে? বাবার প্রেশারটা তো বেড়েই চলছে দিনদিন....”

হয়তো তারপর মেয়েটা কেঁদে ফেলে, আবার হাত তুলে কান্নাটা আল্লাহর কাছেই সপে দেয়: রব্বানা হাবলানা- মিন আযওয়াজিনা ওয়া যুররিয়া-তিনা কুররাতা আ'যুনি.... ছোট্টর জীবনেও এমন পরীক্ষার ছোটখাটো অভিজ্ঞতা আছে, বিয়ের আগের সময়টায় বোধহয় প্রত্যেক মেয়েকেই কমবেশি পরীক্ষা দিতে হয়। ঐ ঘাটের পানি কিছুটা খেয়েছে তাই কিছুটা হলেও আজকের মেয়েটার কষ্ট অনুভব করতে পারছে, যদিও ওর সেই পরীক্ষার তুলনায় এই মেয়েটির পরীক্ষা অনেক বেশিই কঠিন।

আচ্ছা, মেয়েটা কি এই দু'আঙুলো জানে? ও কি গিয়ে শিখিয়ে দিয়ে আসবে? ও কি আপুটার পাশে গিয়ে শক্ত করে হাত ধরে বলবে?

“আপু, তাওয়াক্কাল ‘আল্লাহ্‌হা! কে আছে আল্লাহ ছাড়া যিনি অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন? আর রহমান তার বান্দাহদের যেসব পরীক্ষা নেন, তার প্রত্যেকটির বিনিময় তিনি গুণে গুণে দেবেন, বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন, তিনি যে ভুলে যাননা।”

এইতো সেদিন ছোট্ট নিজেই যখন অসুস্থ হয়ে অধৈর্য হয়ে যাচ্ছিলো, ওর হাজব্যান্ড মাথায় হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলো আর মনে করিয়ে দিয়েছিলো,

“হাশরের ময়দানে মানুষ আফসোস করবে, তাদেরকে যদি আরও কঠিন পরীক্ষা দুনিয়ায় নেয়া হতো, এমনকি গায়ের চামড়াও তুলে নেয়া হতো!”

অসহ্য ও কঠিন পরীক্ষার বিনিময় যে বড় সুমিষ্ট সেদিন....

“ছোট্ট, ভাতটা তুলে আপুদের নিয়ে খেতে বস। আমি একটু তোর আন্টির সাথে কথা বলে আসি।”

মায়ের ডাকে সম্মিৎ ফিরে পায়। খাবারের কথায় পেট গুলিয়ে ওঠে, এ বেলা খেতে পারবে তো? মুখের রুচিটা এখনো পুরো ফিরে আসেনি। তবুও ওকে পারতে হবে, ইনশাআল্লাহ- ও যে এখন একা নয়, নিজের মাঝেই ধারণ করে চলা আরেকটি সত্ত্বা, আল্লাহ সুবহানাহ তাআলার আরেকটি নিয়ামতের আমানতদার সে।

- জ্বি, আম্মু, আসছিইই.....

আল মুমিনের দার্সী

নূরুন আলা নূর

পাঁচতারা সিড়ি ভেঙে বাসায় ঢুকতেই ট্যান্ড্রাম শুরু করলো জেরীন।

-তুমি না বললা দোকান থেকে চকেট কিনে দিবা আ আ আ। কেন দিলা না আ আ আ।

-এহহে মা, একদম মনে ছিল না। বাসার নিচে থাকতেই মনে করলা না কেন।

-লাগবে না। লাগবে না। কিছু লাগবে না আয়ায়ায়া।

সকালে একটা রুটি খেয়ে বেড়িয়েছিল শায়লা, এখন দুপুর। ক্ষুধায় পেট চো চো করছে। বাচ্চাটাকেও খাওয়াতে হবে। ওর ও ক্ষুধা লেগেছে নির্ঘাত। খাবারদাবার গুছাবে নাকি নিচে গিয়ে চকলেট কিনে আনবে ভাবতে ভাবতে বাথরুমে ঢুকলো সে। বাথরুমের দরজার ছিটকিনি আটকাতে যেয়েই বুক ধড়াস করে উঠলো শায়লার। হাতের আংটিটা নেই। ছোট্ট তিন পাথরের আংটি। অনেক শখ করে কেনা। ঈদের উপহার হিসেবে পাওয়া টাকা জমিয়ে কেনা। সামান্য লুজ হতো হাতে, তাই ডান হাতে পড়তো যেন খেয়াল থাকে। কই হারালো!!

ব্যাগ থেকে চাবি বের করার সময় ব্যাগে পরে যায়নি তো?

বাথরুম থেকে বেড়িয়ে তন্ন তন্ন করে ব্যাগ খোঁজে শায়লা। ওদিকে ব্যাক গ্রাউন্ডে বাজছে কান্নার সুর আ আ আ।

নেই ব্যাগে নেই। আতিপাতি করে খোঁজে সে। সব ঢালে ব্যাগ থেকে। টাকার ব্যাগ, খুচরা কয়েন, এলোমেলো পরে থাকা কলম, চোখে দেয়ার কাজল, চুলের কয়েকটা ব্যান্ড, বাচ্চার একটা ডায়াপার। কোন আংটি নেই।

রিকশা একদম বাসার সামনেই থেমেছে। মানে রাস্তায় পড়েনি। হয় রিকশায়, নয়তো বাসার কোথাও। সিড়িটা একবার দেখলে কেমন হয়?

-মা চলো চকেট কিনে আনি।

লাগবেনা লাগবেনা বলতে বলতে মেয়েও পিছু নেয়।

সিড়িতে নেই। গেটের কাছেও নেই। নেই তো নেই। চকলেট কিনে উপরে উঠে আসে।

হঠাৎ কি ভাবে দুই হাত তুলে দুয়া করে সে।

‘আল্লাহ, খুব সুন্দর ছিল আংটি টা। আপনি আমাকে এতদিন এটা পরতে দিয়েছেন,

অনেক শুকরিয়া। এটা খুঁজে পাওয়া যদি আমার জন্য কল্যাণকর হয় তাহলে প্লিজ এটা পাইয়ে দিন। আর যদি এটা হারিয়ে থাকাতেই কল্যাণ থাকে তবে এর বিনিময়ে আমাকে দুনিয়ায় এবং আখিরাতে আরো উত্তম কিছু দিন। আর এই সময়ে আমি যেন মনে মনেও অকৃতজ্ঞের মত কিছু না ভাবি যাতে আপনি নারাজ হন।’
দুয়া টা করেই কেন যেন অনেক হালকা লাগে শায়লার। মেয়েকে গোসল করাতে ঢোকে সে।

.....

পাখির ডাকে চমকে ওঠে শায়লা।

নাহ, কলিংবেল বাজছে। হনুফা আসছে কাজ করতে।

-হনুফা আজকে ঝাড়ুটা একটু যত্ন করে দিও তো আপু, কিছু কাজের জিনিস পাচ্ছি না।
খাট আলমারির নিচে ঢুকে থাকতে পারে।

-আইচ্ছা আফা।

সে নিজেও হনুফার পিছন পিছন ঘুরে।

-টেবিলের নিচে ঝাড়ু দাও হনুফা। খাটের নিচটা আবার দাও। ওকি আলমারির নিচ যে বাদ পরে গেল সোনা।

- দিসি তো আফা।

-আবার দাও আমাকে দেখায়।

পাওয়া গেলনা। ধুর, মেয়েকে ভাত খাওয়াই, খামাখা সময় নষ্ট।

ঝাড়ু শেষে হনুফা বালতিতে পানি নিয়ে আসে, ঘর মুছবে। শায়লা ভাত মাখায় ডাল দিয়ে মেয়ের জন্য, একটু লেবু চিপে নেয় উপরে। পাখির পেট মেয়ের। দুই লোকমা খেয়েই আর খাবেনা।

-আফা দেখেন তো, এটা কি?

মিটিমিটি হাসছে হনুফা। হাতে একটা আংটি। তিন পাথরের। এঁটো হাত নিয়েই সিজদায় পরে যায় শায়লা।

.....

দুপুরে মেয়েকে ঘুম পাড়াতে যেয়ে শায়লারও চোখ বুজে আসে। মেয়ের ঘুম আসেনা, মা চোখ খুলে রাখতে পারেনা। কত্ত কাজ পরে আছে।

কলিংবেলের শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসে শায়লা। মেয়ের ঘুম ভাঙার আগেই দরজা খুলতে হবে। পড়িমরি করে ছুটে দরজা খোলে।

শাহেদ দাঁড়ানো দরজায়।

- আজ এত তাড়াতাড়ি?

- ঘটনা আছে। বসতে দাও আগে।

পানির গ্লাস এগিয়ে দেয় শায়লা। তিন ঢোকে পানিটা শেষ করে দেয় শাহেদ।

- প্রমোশনের অর্ডারটা দিয়ে দিল শিলু।

- আলহামদুলিল্লাহ!!! বলেই সিজদায় শুকর দেয় শায়লা।

অনেকদিন ধরে এই প্রমোশনের অপেক্ষায় ছিল ওরা।

- তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে।

-আমার জন্য? কি? কেন?

-আহ প্যাকেটটা খুলেই দেখোনা।

কাপা হাতে প্যাকেট খোলে শায়লা। প্যাকেটটা দেখে মনে হচ্ছে ক্রেস্টের বক্স ভিতরে। প্রমোশন উপলক্ষে কি ক্রেস্ট দেয় নাকি আজকাল? ক্রেস্ট দিয়ে সারপ্রাইজ দিচ্ছে কেন ভদ্রলোক মনে মনে অবাক হয় সে।

প্যাকেট খুলতেই বের হয় একটা নেকলেস, সোনার।

হতভম্ব হয়ে গেছে সে। দুপুরের দুয়া কবুল করে নিয়েছেন আল মু'মিন। যা চেয়েছিল তা তো দিয়েছেনই সেই সাথে আরো উত্তম উপহার পাঠিয়েছেন। তিনি যে রাজাদের রাজা। তাঁর কাছে হাত পেতে কেউ নিরাশ হয়না।

সিজদায় শুকুর দেয়ার কথাও মনে আসেনা তার এতটাই হতভম্ব হয়ে যায় সে। শুধু মাথায় আসে একটি বাক্য, “আমি তো তোমায় ডেকে কখনো নিরাশ হইনি মালিক।”**
পরিশিষ্ট : নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম বলেছেন, আল্লাহতালা বলেছেন, ‘বান্দা আমার প্রতি যেমন ধারণা রাখে, আমি তার সাথে তেমন আচরণ করি। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, আমি তার সংগেই থাকি। সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করলে আমিও তাকে আমার মনে মনে স্মরণ করি। সে আমাকে কোন সমাবেশে স্মরণ করলে আমি এর চেয়েও উত্তম সমাবেশে তাকে উল্লেখ করি। আর সে যদি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। সে আমার দিকে হেঁটে

এলে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।’
বুখারী ও মুসলিম।

** সুরা মারিয়াম, আয়াত ৪

সুখি দাম্পত্য বিস্তে আনসারী

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা সবচেয়ে জটিল একটা সম্পর্ক।

কখনো মনে হয় এই মানুষটাকে ছাড়া চলবেই না।

আবার কখনো মনে হয় এই মানুষটার সাথে চলাই যায় না।

যখন মনমালিন্য হয়, যখন একটা ভুল হয়, আমরা
ভুলে যাই সেই মানুষটাও মানুষ ;ফেরেশতা না। যখন তার একটা দোষ চোখে পড়ে,
ভুলে যাই আমারও বহু দোষ আছে।

কিন্তু কেন?

আমি সুখি না?

নাকি সুখি হতে চাই না?

একটু থামি আর চিন্তা করি।

হয়ত আজ আমার সাথে যা ঘটেছে তা মন খারাপ করার মতই বিষয়, কিন্তু তাই বলে
কি এই সম্পর্কে ভালো কিছুই নেই? পৃথিবীর প্রতিটি সম্পর্ক দেনা পাওনার। তার
মাঝে ভালো কিছু না থাকলে তাকে ভালবাসতেই পারতাম না।

এমন কিছু ভালো গুন কি তার নেই যা আমাকে সুখি করে?

এমন কিছু মুহূর্ত কি আমার জীবনে আসেনি যার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ থাকব?

এই মানুষটা কি আমার ভরসার একটা মানুষ না?

এই মানুষটা পাশে থাকলে কি আমার নিজেকে নিরাপদ মনে হয় না?

এই মানুষটাই কি সে না যে আমার দোষগুলো সহ্য করে নেয়?

তবে থাক না আজ সে ভুল
তবে থাক না আজ আমি পরাজিত
তবে থাক না আজ রাগটুকু বাঞ্ছা বন্দি
না হয় আজ নাই বুঝল নিজের ভুল!

খুব কি ক্ষতি?

কি লাভ এ বিজয়ের, যদি সম্পর্কটাই তেতো হয়েছে যায়?

এত হিসেব করে কি ভালোবাসা হয়?

যে আমার জন্যে পৃথিবীর সাথে যুদ্ধ করতেও তৈরি, কী আর হয়ে যাবে যদি আজ তার কাছে হেরে যাই?

কী আর হবে?

মানুষটার চেয়ে আমার ইগোর জয় তো বড় হতে পারে না।

হালাল ভালোবাসাগুলো ভালো থাকুক, যত্নে থাকুক।

.....

পাত্রী চাই

সাকিবা আহমেদ

“আপা মেয়ে তো খুঁজে পাচ্ছি না।” চেয়ারে বসতে বসতে হতাশ কণ্ঠে দীপুর মা বললেন।

“আপা কম মেয়ে তো দেখলেন না, কাউকেই তো আপনার পছন্দ হল না।” সাথে সাথে উত্তর দিয়ে দিলেন মায়ার শাশুড়ি।

“এটা কী বললেন আপা? একমাত্র ছেলে আমার একটু দেখে শুনে বিয়ে দিব না?”

“তা তো অবশ্যই। কিন্তু পনেরো-বিশটা মেয়ের কাউকেই আপনার পছন্দ হল না?”

“না...ইয়ে মানে, বলতে চাচ্ছিলাম আর কি আপনার ছোট বউটা কী যেন নাম? নীতু? মা শা আল্লাহ্ রূপে গুণে পরীর মত আপা। অমন একটা বউ পেলে আর কিছু লাগে বলেন? অমন মেয়ে তো একটাও পেলাম না।”

মায়ার শাশুড়ি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন“ ,আপা আমার ঘরে কিন্তু তিনটা বউ। একজন বেশি ফর্সা সুন্দর মানে যে বাকীদের কোন দাম নেই তা কিন্তু না। আমার চোখে ওরা তিনজনই সমান।”

“না না আপা আপনার তিন বউই অনেক ভাল মা শা আল্লাহ্। কিন্তু ছোট বউটাকে আমার একদম পরীর মত লাগে।”

“আপা এটাই তো আমাদের সমস্যা! আসলে আমরা যতোই মুখে ধর্মের কথা বলি না কেন সামাজিক সমস্যাগুলো থেকে নিজেদেরকে আমরা বের করতে পারিনি এখনো। যেখানে গায়ের রঙ এর উপর মেয়েকে সম্মান দেওয়া হয়, ঘরের কাজ করতে পারে না মানে সেই মেয়ে সংসার করার যোগ্যই না। বাপের বাড়ির টাকা পয়সার উপর মেয়েকে আদর যত্ন করা হয়।

“হুম, ঠিকই বলেছেন আপা। আসলে সুন্দর শিক্ষিত একটা বউ না আনলে আত্মীয় স্বজনরাই পরে কথা শোনাবে। এই আর কি।”

“তা বটে! আমরা তো আল্লাহ কে কম মানুষকে বেশি ভয় পাই। সমাজ বলে কথা!”

“কী যে বলেন আপা! সমাজ ছাড়া কে চলতে পারে বলেন? আচ্ছা আমাকে আর কয়টা মেয়ের খবর দিয়েন তো। ছেলেটা বিয়ে বিয়ে করে মাথা খাচ্ছে।”

“তো খাবে না? বয়স তো কম হল না ছেলের। যাদের কে বাদ দিয়েছিলেন তাদের ভেতর থেকেই দেখেন না হয় আবার।”

“তারা তো সবাই এখনো লেখাপড়া করছে!”

মায়ার শাশুড়ি আবারো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন“ ,এই যে একটু আগে আমার ছোট বউ এর সুনাম করলেন, ও তো এখনো লেখাপড়া করছে। সাথে সংসারও সামলাচ্ছে মা শা আল্লাহ। ওর ক্লাস এর সময়, পরীক্ষার সময় আর পড়ার সময় ওর কাঁধে কোন কাজ দেই না আমরা, আমার বাকি দুই বউও এই ব্যাপারে যথেষ্ট সহযোগিতা করে মা শা আল্লাহ। একটু তো ছাড় দিতেই হবে শিক্ষিত বউ চাইলে তাই না”?

“এটা তো অনেক বড় সমস্যা আপা! পাশের বাসার লিপি ভাবীর বউ এই পড়ার নাম করে নিজের ঘর থেকেই বের হয়না! আমি ছেলের বিয়ে দিব নিজে একটু আরাম করব তাই। এই বয়সে আর কতো খাটা যায় বলেন?”

মায়ার শাশুড়ি অবাক হয়ে বললেন“ ,আপা আপনার মেয়ের পড়ার সময় কি আপনি তাকে একটু ছাড় দেন না কাজ কর্ম থেকে? তাহলে বউ কে কেন দিবেন না? সে শিক্ষিত হলে কি আপনার কোন লাভ নেই? আপনার বংশধর একজন শিক্ষিত মা পাচ্ছে আপনি একজন শিক্ষিত বউ পাচ্ছেন। মানুষকে আরো গর্ব করে বলতে পারছেন আপনি আপনার বউ এর পড়ালেখায় সাহায্য করেছেন! আর সে তো আজীবন লেখাপড়া করছে না।”

“না না আপা। এরপর লেখাপড়া শেষ করে বলবে চাকরি করব! তখন? আমার ষোলকলা পূর্ণ হবে।”

“তাহলে আপনিই সিদ্ধান্ত নেন কী করবেন। ছেলের বয়স ৩৩ পার হতে চলল এখনো আপনি এতো খুত খুত করছেন মেয়ের ব্যাপারে। এটা কী ঠিক হচ্ছে? আপনি নিজেকেই প্রশ্ন করুন।”

“নাহ আপা, এটাও ঠিক বলেছেন। কবে না কবে মরে যাই তার আগে নাভী নাভনীদেব মুখ দেখব না?”

মায়ার শাশুড়ি হেসে দিয়ে বললেন“ ,সন্তান নেওয়াটা কী মানুষের হাতে নাকি? আল্লাহ্ যখন চাইবেন তখনই না দিবেন”!

“তা তো ঠিকই। আমি দীপু কে বলে দিয়েছি বিয়ের ৬ মাসের ভেতর প্রমোশনের ব্যবস্থা করতে নয়তো কোথাও ছুটির দুই দিন পার্ট টাইম শুরু করতে। বাচ্চার জন্য অতিরিক্ত খরচ আছে না?”

মায়ার শাশুড়ি শেষবারের মত দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন“ ,আজ আমি উঠি আপা। বড় ছেলেটা চাকরী ছেড়ে দিয়েছে গত মাসে। আজকে ওর আরেক জায়গায় ইন্টারভিউ, ওদিকে ওর বউ এর ডেলিভারি ডেইট আগামি মাসে। এই নিয়ে কিছুটা চিন্তায় ছিলাম। বড় বউ সকালে বলল, একদম চিন্তা করবেন না মা। রিষিকের মালিক আল্লাহ্! কোথাও না কোথাও থেকে কিছু না কিছু ঠিকই ব্যবস্থা হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ্ এমন অবস্থায় আমি ওকে স্বাভাবিক দিব কী উলটা সেই আমাকে বোঝাচ্ছে! বাসার সবাই একটু আধটু চিন্তা করলেও আল্লাহ্র উপর আমাদের ভরসা আছে নিশ্চয় উনি উত্তম কিছুই রেখেছেন আমাদের জন্য। এমন একটা সময় হয় হতাশ না করে আমরা দুয়া করে যাচ্ছি। আল্লাহ্ তো বলেছেনই আমি আমার বান্দার প্রতি তেমনই যেমন সে আমার উপর ধারণা রাখে।

ইন শা আল্লাহ্ সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার ছেলে নিশ্চয় সারা জীবন বেকার বসে থাকবে না? সে যথেষ্ট দায়িত্ববান। এখন তার দরকার একটু মানসিক সাপোর্ট। যেটা দেওয়ার চেষ্টাই আমরা করছি। দুয়া করবেন আমাদের জন্য। আমিও দুয়া করব যেন আপনার ছেলে ভালো একজন পাত্রী পেয়ে যায় যে মনে প্রানে একজন ভাল মানুষ হবে, সামাজিক কলুষতা থেকে যে নিজেকে মুক্ত করে সুষ্ঠু স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করতে পারবে ইন শা আল্লাহ্ ।

“আপনাদের কথা শুনে তো আমিই টেনশন এ পরে গেলাম আপা! এ কী অবস্থা আপনাদের? এমন কেন হল? আহারে ছেলেটা! আচ্ছা বাচ্চা হওয়ার খরচ তো মেয়ের বাড়ি থেকেই দেওয়ার কথা, তাই না?”

“এটা কী বললেন আপা? বাচ্চা হবে আমার ছেলের! বংশধর আসবে আমার! সেটার খরচ মেয়ের বাপের বাড়ি কেন দিবে? এসব প্রথা অতি শীঘ্রই দূর না করলে সাংসারিক অশান্তি গুলোও কোনদিনও শেষ হবে না আপা।

আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা দুশ্চিন্তা করছি না। আপনিও করবেন না। শুধু সম্ভব হলে দুয়া করবেন।

আজ তাহলে আসি।

ফি আমানিল্লাহ্।”

“ফি আমানিল্লাহ আপা।” এরপর দীপুর মা চোখ মুখ কুঁচকে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

ফরজ হয়ে যায়নি তো!

ফাহিমদা হুসনে জাহান

সেদিন বেড়াতে গেলাম এক আত্মীয়ের বাসায়। ভাবি আমার প্রায় বছর দশেক বড়। আমাকে বলছিলেন, “এত অল্প বয়সে হজ্জ করে ফেললা, ভালোই করেছে। আমার তো এখনো ফরয হয় নাই, শুধু যাকাত ফরয। আমার শুধু গয়না আছে। আমি তো চাকরি করিনা আর কোন ক্যাশ টাকাও নাই। আর আমার ছেলেরা আমাকে ছাড়া এক মিনিটও থাকতে পারেনা।”

সেদিন ভাবির কথা শুনে বুঝলাম, হজ্জ ফরযের ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার না।

সত্যি কথা, আমরা জানা ছিল না। আমরা নামাজ, রোজা, যাকাত, কুরবানি এসবের নিয়ম যতটা জানি; সে তুলনায় হজ্জের ব্যাপারে তেমন কিছু জানিনা।

এর পিছনে যে কারন আমার মনে হয় যেহেতু হজ্জ একবারই ফরয, বেশিরভাগ মানুষ ভেবেই নেন শেষ বয়সে হজ্জ করবেন। আর সে সময় জানলেই চলবে।

আচ্ছা, শেষ বয়স কার কবে সেটা কি কেউ বলতে পারে? আমরা হজ্জে যাওয়ার কিছুদিন আগে আমার শ্বশুরের বন্ধু এবং প্রতিবেশী, দুজনা একই বয়সি – শুক্রবার বাজার করতে যাচ্ছিলেন। বাসা থেকে নেমে সিঁড়ির কাছে বসে পড়েন, কিছুক্ষনের মধ্যে মৃত্যু। আমার শ্বশুর যখন হজ্জে যান, তাকে খুব করে বলছিলেন যেন তিনিও হজ্জ করে নেন। কিন্তু তিনি জানালেন এত দ্রুত(!) হজ্জে যাবেন না, পরে করবেন। শেষ পর্যন্ত ফরয হজ্জ আদায় না করে মারা গেলেন। পরে পরে করতে করতে পরপারে চলে গেলেন। বিভ্রান ছিলেন, তার কোন কিছুই কমতি ছিল না। সন্তানরা বাবার মৃত্যুতে শোক পালন করেছে ঠিকই, কিন্তু তারা কি তাদের বাবার হজ্জটা আদায় করে দেয়ার মানসিকতা রাখে?

সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য হজ্জ করা অবশ্য করণীয় মৌলিক ইবাদাত।

এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে –

“মানুষের উপর মহান আল্লাহর অধিকার হল, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার শক্তি ও সামর্থ্য রাখে সে যেন হজ্জ সম্পাদন করে এবং যে ব্যক্তি এ নির্দেশ অমান্য করে কুফরীর আচরণ করবে তার জেনে রাখা উচিত, মহান আল্লাহ বিশ্বজগতে কারো মুখাপেক্ষী নন।” (সূরা আলে ইমরান -৩/৯৭)

রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যদি কোন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে অস্বচ্ছল অবস্থায় না থাকে, কিংবা রোগগ্রস্ত না হয়ে পড়ে, অথবা কোন অত্যাচারী শাসকের পক্ষ থেকে কোন বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি না হয়ে থাকে; তার পরও যদি সে হজ্জ সম্পাদন না করে, তবে সে চাই ইহুদি বা খৃষ্টানদের মত মৃত্যুবরণ করুক, তাতে কিছুই যায় আসেনা।

আরেক দল আছেন যারা জানেন না তাদের উপর হজ্জ ফরয কি না, কিন্তু তারা অন্যান্য ইবাদাতের বিষয়ে সিরিয়াস। অনেকেই হজ্জ এবং যাকাতের নিয়ম গুলিয়ে ফেলেন। কারো কারো ধারণা, অটেল টাকাকড়ি থাকলে হজ্জ ফরয। আবার অনেকেই নিয়ম জানেন, কিন্তু একসাথে এত টাকা এখনি খরচ না করে পরে করবেন ভাবেন। তাদের সামনে অনেক খরচ, মেয়ের বিয়ে, নতুন বাড়ি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আরেকজনের কথা বলি। তিনিও বিভবান, সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। হজ্জ ফরয হয়েছে বহুদিন। কিন্তু মেয়ের বিয়ে না দিয়ে তিনি যাবেন না হজ্জে। মেয়ের বিয়ে হলো ঠিকই। কিন্তু ততদিনে তিনি হজ্জে যাবার আর্থিক সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছেন। হজ্জ দূরে থাক, অন্যের যাকাতের টাকায় তার সংসার চলে। কিন্তু মাথায় ফরয হজ্জ রয়ে গেছে।

আরেক দল আছেন, যারা ভাবেন মরার আগে হজ্জ করলে যেহেতু সব পাপ মাফ হয়ে যায়; তাই একবারে সব পাপ করে, মরার আগে ভালো হয়ে, নিষ্পাপ হয়ে মারা যাব। আমার মনে হয়, হজ্জের ব্যাপারে কম জানার কারণ অসচেতনতা। একজন মুসলিম যখন নামাজ না পড়েন, রমাদানে রোজা না রাখেন – আমরা তাকে ডাকি, বোঝাই এসবের গুরুত্ব। জেনে বুঝে একটা ফরয তরক করা বিরাট গুনাহের কাজ। অনেক আলেম বলেন, ফরয কাজ ছেড়ে দিলে সে আর মুসলিম থাকে না। আর হজ্জ এমনই একটা ফরয, যাকে আমরা মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছি না। যা একই মানের ফরয কাজ, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি। পার্থক্য শুধু, নামাজ সবার উপর ফরজ আর হজ্জ শুধু বিভবানদের জন্য।

আমাদের দেশে যারা হজ্জ করেন, তাদের বেশির ভাগ বয়স্ক মানুষ। এই বছর যারা হজ্জ করেছেন তাদের প্রায় ৮০ ভাগ লোকের বয়স ৫০ এর বেশি। আমাদের ধারণা, হজ্জ বৃদ্ধ বয়সের ইবাদাত।

যারা এসব ধারণার মধ্যে আছেন, অনেক বড় ভুলের মধ্যে আছেন। এগুলো হজ্জ থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য শয়তানের মহা ষড়যন্ত্র।

মহিলারা আরো বেশি অসচেতন হজ্জের ব্যাপারে। দেশে অসংখ্য মহিলার হজ্জ ফরয।

এ বছর আমাদের দেশ থেকে যাওয়া মহিলা হাজি ৩৫ শতাংশ, যা পুরুষের প্রায় অর্ধেক। অথচ মহিলাদের হজ্জকে জিহাদতুল্য ইবাদাত বলা হয়েছে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, “হে আল্লাহর রাসুল(সাঃ) আমরা জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করি। কাজেই আমরা কি জিহাদ করবো না? তিনি বললেন, না, বরং তোমাদের মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হল, হজ্জে মাবরুর। (সহীহ বুখারী_ হজ্জ অধ্যায়) মহিলাদের হজ্জে যাবার অন্যতম বড় শর্ত মাহরাম। যদি স্বামী হজ্জে যেতে অক্ষম হন, সেক্ষেত্রে তিনি তার অন্য যে কোন মাহরামের সাথে হজ্জে যেতে পারবেন। (সহীহ বুখারী)

এই লেখা পড়ার পর অনেকেই আবিষ্কার করবেন আপনার উপর হজ্জ ফরয হয়ে গেছে অনেকদিন আগেই।

আসুন জেনে নিই কত সম্পদের মালিক হলে হজ্জ ফরয হয়।

হজ্জ ফরজ হবার শর্ত, আপনাকে সে পরিমাণ সম্পদের মালিক হতে হবে যতটুকু থাকলে মক্কায় যাওয়া আসা এবং সেখানে থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। আর এই ক’দিন আপনার বাসার খরচপত্রাদীও থাকতে হবে।

এখানে আপনি চাকরি করেন না করেন কিছু যায় আসে না। আপনার মাসিক কোন ইনকাম শর্ত নয়। বর্তমানে যিনি অন্তত ৩-৪ লাখ টাকার সম্পদের মালিক তার উপর হজ্জ ফরয। সম্পদ ক্যাশ হতে পারে আবার অন্যকিছু। যেমন মহিলাদের গয়না, দেনমোহর এর টাকা ইত্যাদি। এমন জমি, বাড়ি, গাড়ি, ফসল যেটা তার নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচে লাগে না। যদি কেউ জীবনে কোন এক সময় এই সম্পদের মালিক হয়ে যান, কিন্তু পরে সেটা পরে খরচ হয়ে যায়, তাতেও হজ্জ ফরযই থেকে যাবে। সম্পদের মালিকানা এক বছর পূর্ণ হওয়া কোন শর্ত নয়। কারো একাধিক বাড়ি আছে যার একটায় তিনি থাকেন, অন্যটার ভাড়ায় সংসার চলে। আরো দুইটা বাড়ি

আছে যা এক্সট্রা। হয়তো তার কোন ক্যাশ টাকা নেই। সেক্ষেত্রে সেই এক্সট্রা বাড়ি বিক্রি করেই তাকে হজ্জ য়েতে হবে। একই কথা গাড়ি, আবাদযোগ্য জমি অথবা অন্য য়ে কোনো সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেউ এই পরিমাণ সম্পদ ব্যবসায় লাভ করলেন অথবা রিটায়ার্ড হবার পর এককালীন টাকা পেলেন – য়ে টাকাটা না হলেও তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় কোন প্রভাব পড়ে না, তার উপর হজ্জ ফরয হয়ে যায়। অনেকে পরিকল্পিতভাবে অর্থ হাতে আসার সাথে সাথে সেটা খরচ করে ফেলেন। এতে যাকাত দিতে হবে না, য়েহেতু এক বছর সেটা থাকে না। কিন্তু হজ্জ ফরয হয়ে যায়।

অর্থাৎ, এমন পরিমাণ সম্পদ, যা আপনার প্রয়োজনের অতিরিক্ত, নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে লাগে না। যা আপনার কাছে জীবনের য়ে কোন এক সময়ে হাতে এসেছিল, আছে বা খরচ হয়ে গেছে, কিন্তু হজ্জ ফরয রয়ে য়াবে।

আপুদের জিজ্ঞাসা করি – য়ারা পর্দা করেন, কেন করেন? অবশ্যই বলবেন, পর্দা আল্লাহর হুকুম, এটা ফরজ। না মানলে গুনাহগার হতে হবে, তাই।

হজ্জের ব্যাপারটা একেবারে সেইম।

এবার বলেন, পর্দা যখন থেকে ফরয তখন থেকে করতে হবে, নাকি নিজের যখন মনে চাইবে, তখন করবেন? অবশ্যই পর্দা যখন থেকে ফরয তখনই শুরু না করলে গুনাহ হবে।

এবার পর্দার জায়গায় হজ্জ শব্দটা লাগান, কি বুঝলেন ?

ধরেন, রাস্তায় একটা মেয়ে বেপর্দা হেটে যাচ্ছে। আপনার কী মনে হয়, মেয়েটা পর্দা কেন করেনা? কারন হতে পারে সে জানে না, অথবা হতে পারে জেনেও মানেনা।

এবার বলেন, সে জানেনা বা মানেনা এই দুটোর কোনটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য? আপনার কি মনে হয়, এই “জানিনা” বলাটা আমাদের জন্য কতটা গ্রহণযোগ্য। আপনি কি জানেন এবার মিস ওয়ার্ল্ড কে হয়েছে? আমাদের দেশে এই নিয়ে কত কাহিনী হয়েছে? ফেসবুকের জনক কে? এখন পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়লোক কে? সৌদি আরব একটা রোবটকে নাগরিকত্ব দিয়েছে, সে দেশে আসছে – তাও তো জানেন নিশ্চই? তাহলে আপনি যখন বলবেন, হজ্জ ফরয কি না জানি না, সেটা কি গ্রহণযোগ্য? জবাব নিজেকে দিন। হাতের সেটটা থেকে দুই চারটা টিপ দিলেই য়ে জরুরি জিনিশটা জানা যায়, সেটা আপনি না জানলে তার জন্য আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন, তাই ভাবছেন?

এখনো সময় আছে, আসুন সচেতন হই।

ফিরে আয়, প্লিজ !

-সিহিন্তা শরীফা

ক্লাস শেষে বাসায় ফিরে দেখি আমার ঘরে ছোট্ট একটা পাখির খাঁচা। ভেতরে কিউট এক জোড়া মুনিয়া পাখি ঘোরাঘুরি করছে। সেদিন ছিল আমার জন্মদিন। মার কাছ থেকে উপহার পাওয়া পাখিগুলোর নাম দিলাম কিচির আর মিচির। সারাদিন ওদের খাবার দেয়া, মিনারেল ওয়াটারের বোতল কেটে ওদের খাবার আর পানির পাত্র বানিয়ে খাচায় সেট করা, বসে বসে ওদের কার্যক্রম দেখা – এসব করেই দিনটা পার করে দিলাম। পরের দিন ক্লাস থেকে ফিরে দেখি মিচিরকে কেমন যেন স্বাস্থ্যবান মনে হচ্ছে! মানে মিচির নামের শুকনো-পাতলা পাখিটা হঠাৎ মোটা-তাজা হয়ে গেছে, সাইজেও আগের চাইতে বড়। পরে আসল ঘটনা জানলাম। তুই খাঁচার দরজা খুলে কী করতে গিয়ে একটা পাখি উড়ে চলে গিয়েছিল। চুপচাপ আরেকটা পাখি কিনে এনে রেখে দিয়েছিলি সেখানে।

মা যখন প্রথম জব করা শুরু করলেন, তুই তখন ছোট্ট একটা বাচ্চা। বাথরুমের ট্যাপ ছেড়ে পানির শব্দে ভয়ে চীৎকার করে কাঁদতিস। আমি তোর দেখাশোনা করতাম – চুল আচড়ে দেয়া থেকে শুরু করে ভাত মেখে দেয়া, মাছ বেঁছে দেয়া...। অনেক জেদী ছিলি, তোর সব জেদ সব রাগ আমি সহ্য করতাম। একা একা খেলার সময় আমি তোকে সময় দিতাম। A B C D , অ আ ক খ পড়াতাম। ধর্মের বই, গল্পের বই পড়ে শোনাতাম। আমার ঘাড়ে চড়ে সার্কাস সার্কাস খেলা ছিল তোর খুব পছন্দের একটা খেলা। আদর করে কত নামে তোকে ডাকতাম, মনে আছে তোর?

স্কুলে যখন ভর্তি হলি, ক্লাস থেকে বের হয়ে আমার ক্লাসের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকতিস। ছোট্ট দুই হাতে চোখ মুছে ফুঁপিয়ে কাঁদতিস। বাসায় ফেরার সময় আমার জামা পেছন থেকে ধরে ধরে হাটতিস। একবার স্কুল ছুটির পর রাস্তায় ভীড়ের মাঝে হারিয়ে গেলি। তোকে খুঁজতে বেরোলাম রিকশায় করে। অনেকক্ষণ পর যখন সেই রিকশাওয়ালা বলল এভাবে পাওয়া যাবে না, মাইকিং এর ব্যবস্থা করেন – হাউমাউ করে কেঁদে দিয়েছিলাম আমি।

তাকে বলা হয়নি – পাঞ্জা লড়ার সময় আমি প্রত্যেকবার ইচ্ছে করেই হেরে যেতাম।
তোর আঁকা ছবিগুলো কিসের ছবি এঁকেছিস না বুঝেই প্রশংসা করতাম। মা তোর
উপর রেগে গেলে তোর পক্ষে সাফাই গাইতাম। তাকে আড়াল করে কখনো নিজের
ঘাড়ে দোষ নিতাম। একসাথে তোর পছন্দের কিছু খেতে বসলে তাকে বেশি দিয়ে
আমি কম নিতাম। ছোট্ট একটা ক্যান্ডি আমি তাকে না দিয়ে একা খেতে পারতাম না।
সেই তুই ধীরে ধীরে একদিন বড় হয়ে গেলি। আমার চাইতে লম্বা, হাতগুলোও আমার
হাতের চাইতে বড়। আমাকে গীটার লেসন দিতিস যখন, তোর মত করে ধরতে
পারতাম না বলে হাসতিস। বাসার পিসিতে তুই মিউজিক কম্পোজ করতিস আর আমি
ভয়েস দিতাম। মনে আছে আমরা এফএল স্টুডিওতে লিংকিং পার্কের গান করেছিলাম?
হা হা হা। জানিস, আমার জীবনে তুই একমাত্র মানুষ যাকে আমি তুই করে বলতাম!
সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে সব বদলে যাচ্ছিল। তুই বড় হয়ে গেলি। নতুন সব
বন্ধু জুটলো। ওদের সাথেই কাটতে লাগলো দিনের বড় একটা অংশ। আমিও
ভার্সিটিতে উঠে শ্রোতে গা ভাসালাম।

ধীরে ধীরে দূরত্ব বাড়ছিল আমাদের চিন্তা-চেতনা, আইডিওলজিতে। একসময়ের নাস্তিক
আমি সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারলাম যেদিন, যখন তাঁর পাঠানো বিধানকে নিজের way
of life হিসেবে মেনে নিলাম – অদ্ভুত এক আলোর পৃথিবী খুঁজে পেলাম যেন।
তারপর...কী থেকে কী হয়ে গেল! ছিটকে দু'জন দূরে সরে গেলাম যেন। ধরা ছোঁয়ার
বাইরে, অনেক অনেক দূরে। আমার নতুন পৃথিবীতে শুরু করলাম নতুন জীবন। আর
তুই হারিয়ে গেলি, ভেসে গেলি সেই পুরনো শ্রোতে। কেমন যেন অচেনা হয়ে গেলি
তুই।

এরপর বছরে এক কি দু'বার দেখা হতো আমাদের। তুই আর স্বাভাবিক হতে
পারিসনি। সত্যের পথে আহবান জানিয়েছিলাম – গ্রহণ করতে পারলি না তুই। উল্টো
আমার চোখের সামনে বিভ্রান্তির কালো গহবরে তলিয়ে যেতে লাগলি। নিকষ কালো
পৃথিবীতে, অশান্তির জীবনটা বেঁছে নিলি। আর, আমার সাথে সব রকম যোগাযোগ বন্ধ
করে দিলি।

তুই জানিস না আমি কতটা কষ্ট পেয়েছি যেদিন ফেসবুকে আমাকে ব্লক করেছিলি।
যখন তোর বদলে ফেলা নতুন নাম্বারটা আমাকে দেয়া হয়নি। যখন দিনের পর দিন,
মাসের পর মাস আর বছরের পর বছর আমাদের দেখা হওয়া তো দূরের কথা –

কথাও বলা হয় না আর। তুই জানিস না, মার কাছে ফোন করে এখনো তোর খোঁজ নিই আমি।

অসুস্থ হয়ে তুই হাসপাতালে ভর্তি। আমার ছোট ছোট বাচ্চাদের রেখে দেখতে যাওয়া সম্ভব ছিল না। দূর থেকে শুধু কেঁদেছি আর দুআ করেছি। সেই সত্ত্বার কাছে দুআ করেছি যার হাতে তোর প্রাণ। যার অনুমতি ছাড়া একটা নিঃশ্বাস ফেলা সম্ভব না। যিনি তোর, আমার আর সবকিছুর স্রষ্টা। সবকিছুর!

আমি তোকে বোঝাতে পারব না তোর জন্য আমার কত কষ্ট হয়। এখনো আগের মতই স্নেহ করি, ভালোবাসি। সেই আল্লাহর কাছে আমি তোর হিদায়াতের দুআ করি – যিনি তোর আর আমার মালিক। সত্যপথের সন্ধান করেছিলাম বলে যিনি আমাকে অন্ধকার থেকে আলোতে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

তুইও ফিরে আয়। দেখবি, সুশৃঙ্খল এই জীবনধারায় শুধু শান্তি আর শান্তি। বড় বড় কষ্টগুলোকেও এখানে তুচ্ছ মনে হয়। যে কোন স্যাট্রিফাইস হাসিমুখে করা যায়।

স্বার্থপরের মত শুধু নিজের জন্যে না – সত্যিকার অর্থে অপরের জন্য বাঁচা যায়।

জেনে রাখিস, একদিন এমন একটা সময় আসবে – প্রত্যেকটা কাজের হিসেব নেয়া হবে। প্রতিটা মানুষের মুখোশ উন্মোচিত হবে সেদিন। দেখবি কত কুৎসিত তোর চারপাশ – সৌন্দর্যের মিথ্যা আবরণে ঢাকা এই চাকচিক্যময় দুনিয়া। গান-বাজনা মনকে নিয়ন্ত্রণ করে। স্যাটানিক গানগুলো তো শুধুই শয়তানের পথে হাতছানি দেয়। নিজের অজান্তে তোর সত্ত্বাটা একসময় শয়তানের দাসত্ব বরণ করে ফেলে। এর থেকে বের হওয়া খুব কঠিনরে। কিন্তু একবার বেরিয়ে আসতে পারলে তোকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হবে না। দুনিয়ার জীবন একটাই। বিশ্বাস কর, সাময়িক ভালো লাগাগুলো আসলে ভ্রম ছাড়া কিছুই না। যদি তুই বুঝতিস!

আমার এই আহ্বান অস্বীকার করলে অনন্তকালের আগুনে জ্বলবি তুই, একথা ভাবতেই দুই দশক আগের সেই ছোট্ট নিষ্পাপ মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সময় আর সঙ্গ কতটা বদলে দেয় মানুষকে। কারো চোখ খুলে দেয়, আর কাউকে বানিয়ে দেয় চোখ থাকতেও অন্ধ।

একবার পেছন ফিরে চেয়ে দেখ ভাই, কত আকুল হয়ে ডাকছে তোর বোন! দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে সৃষ্টিকর্তার কাছে আত্মসমর্পণ কর। সব কষ্ট, সব বেদনা পেছনে ফেলে অসীম আনন্দের সেই বাগানে হাসিমুখে মৃত্যুহীন জীবন কাটাও আমরা।

ফিরে আয়, ভাই আমার!

.....

#রৌদ্রময়ী_খোলা_চিঠি

আধার আলো আনিকা তুবা

[১]

পেটের মধ্যে হঠাৎ একটা গুঁতো খেয়ে চমকে উঠলাম, কদিন ধরেই দেখছি পেটের মধ্যে লাগে কী যেন মোচড়ামুচড়ি করছে। ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। বড়ো কোনো অসুখ হলো না তো! কিছু একটা হলেই আমার প্রথমে মরার চিন্তা মাথায় আসে। ছোটবেলা থেকেই আমি একটু ভীতু প্রকৃতির। একবার জ্বর হলো ছোটবেলায়, সাথে দুইবার হড়হড় করে বমি করলাম, বমির সাথে রক্ত দেখে আমি ভয়ে শেষ! মনে মনে ভাবলাম ব্লাড ক্যান্সার, আমি বুঝি মারা যাচ্ছি। চোখ ঠেলে পানি বেরিয়ে এলো, যতোটা না অসুখের প্রকোপে, তারচেয়ে অনেক বেশি আশু মৃত্যুচিন্তায়। এই পৃথিবী থেকে এতো ছোট বয়সেই চলে যাবো? সে যাত্রা অবশ্য বেঁচে গেছিলাম... কিন্তু এবার কী হলো?

চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়ে বসে আছি, এদিকে মিতু ফোন দিলো। মিতু আমার সাথেই পড়ে, এক নম্বরের বদ মেয়ে। দুনিয়ার সব ছেলেকে এক হাতে কিনে আরেক হাতে বেঁচতে পারবে। ছেলে পটাতেও সেরা, ছেলে নাচাতেও সেরা। ওর সামনে দুনিয়ার সকল প্লেবয় শিশু। তবে প্রেমিকা হিসেবে যেমনই হোক, বন্ধু হিসেবে অসাধারণ। এমন কোনো বিপদ-আপদ নাই যখন ওকে পাশে পাওয়া যায় না। একটা ডাক দিলে দিন নাই রাত নাই হাজির হবে। বাসা থেকেও প্রচুর স্বাধীনতা পায়। ধনীর ঘরের আদরের দুলালি, আমাদের মতো এতো রেস্ট্রিকশন নাই তাই বাপ-মায়ের সাথে অতো লুকোছাপা করতে হয় না।

– হ্যালো, হ্যাঁ বল।

– কীরে এতোক্ষণ লাগে ফোন ধরতে?

– একটু টেনশনে ছিলাম....

– ক্যান কী অইসে?

– মনে হয় বড়ো কোনো অসুখ। ফট কইরা মরে যাবো..

– ঢং করস? কী হইসে ঠিক করে বল

- আমি সিরিয়াস দোস্ত। একটু আগেই হঠাৎ মনে হইলো একটা শিং মাছ গুঁতা মারলো, এই যে এইমাত্র আবার!! খুবই টেনশনে আছি মিতু, অসুখ-টসুখ কী যে হইলো...

- ওহ নো! তুই এতো টেনশন করিস না, তোর প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা আছে তো? না করে থাকলে টেস্ট করে আমাকে একটা কল দে।

আমার বুকের মধ্যে ছ্যাৎ করে উঠলো! মিতুর মুখে কিচ্ছু আটকায় না। প্রেগনেন্সি টেস্ট ওর জন্য ছেলেখেলা। আমার তো কথাটা মাথাতেই আসে নাই।

আচ্ছা রাখি এখন, বলে কোনোমতে ফোনটা রেখেই দৌড় দিলাম। ড্রয়ারের মধ্যে কাপড়চোপড়ের তলে রাখা স্ট্রিপগুলো থেকে একটা স্ট্রিপ টেনে বের করে হাতে নিলাম। মাথা দপদপ করছে। সত্যিই যদি এমন কিচ্ছু হয়! কী করবো, কোথায় যাবো! সুমন! সুমনকে একটা ফোন দিতে হবে এক্ষুণি!

ফোনটা তুলে নিজের অজান্তেই আবার মিতুকেই লাগলাম।

- করেছিস?

- সাহস পাচ্ছি না। যদি সত্যি প্রেগন্যান্ট হই? আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললাম।

- তুই এখনও দাঁড়ায় আছিস স্টুপিড!! যা তুই, আগে হোক তারপর বাকি চিন্তা। আমি ফোন ধরেই আছি, তুই এক্ষুণি করে আয়।

- ওকে!

একটা দাগ একটু একটু করে ভেসে উঠছে। একটা মানে নেগেটিভ... মাথা কাজ করছে না। রাখরুমে বসেই মনে মনে আল্লাহকে ডাকছি! “হে আল্লাহ, নেগেটিভ দাও, নেগেটিভ দাও...” একটা রেখা এখন পুরোটা ভেসে উঠেছে। আরেকটা রেখা না ভাসলেই হলো। “ওহ আল্লাহ! আমি ভালো হয়ে যাবো, নামাজ পড়বো পাঁচ ওয়াক্ত, আরেকটা দাগ যেন না উঠে... প্লীজ প্লীজ প্লীজ...” একি! আরেকটা দাগ.. আন্তে আন্তে দ্বিতীয় দাগটাও স্পষ্ট হয়ে উঠলো। না, এ হতে পারে না। আমি আর সুমন সব সময় প্রোটেকশন ব্যবহার করেছি। তাহলে, কীভাবে!

ঠোঁট-মুখ শুকিয়ে গেছে। আরেকবার টেস্ট করতে হবে। এখনই নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। অন্য কোনো কারণে কি পজিটিভ রেজাল্ট দেখাতে পারে? দেরি করা যাবে না, কালই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

– হ্যালো, মিতু।

– বল

– আই থিঙ্ক আই অ্যাম প্রেগন্যান্ট। তুই কালই আমার সাথে ডাক্তারের কাছে যেতে পারবি?

– ওকে নো প্রবলেম! বাট ডোন্ট প্যানিক মাই লাভ, ওকে?

– ওকে

ফোনটা ছেড়ে সোফাতেই গা এলিয়ে দিলাম। খুব ক্লান্ত লাগছে। হাতটা অটমेटিক চলে গেলো পেটের ওপর। আমার পেটে সত্যিই কি সুমনের বাচ্চা? প্রথম বাচ্চা পেটে আসার অনুভূতিটা কেমন হওয়ার কথা? ভয়, আতঙ্ক, উদ্বেগ ছাড়া আমার মধ্যে আর কোনো অনুভূতিই কাজ করছে না।

মিতুর সাথে অদ্ভুত একটা হাসপাতালে গেলাম পরদিন। আমি জানি, ও এসব জায়গা ভালো চেনে। ওর অভিজ্ঞতা আছে। হাসপাতালে পরীক্ষা করেও একই রিপোর্ট পেলাম। ডাক্তার লোকটা দুলেদুলে হেসে বললো, ডোন্ট ওয়ারি, আমাদের সব ব্যবস্থা আছে। শুধু একটা স্ক্যান করে জেনে নিন প্রেগনেন্সি কতদিনের হলো তিন-চার মাসের হলে সহজেই ব্যবস্থা করা যাবে। খুবই পরিষ্কার ইঙ্গিত। অবশ্য আমি মোটামুটি মানসিক প্রস্তুতি আগে থেকেই নিয়ে এসেছি, বিয়ের আগে এই মুহূর্তে বাচ্চা পেটে আসলে অব্যবহাল করাবো। এছাড়া আর কীই বা উপায়? সুমনের এখনও পড়াশোনাই শেষ হয় নি। বিয়ে করার মতো কোনো সামর্থ্য ওর এখনও নেই। আর আমার বাবা-মায়ের কাছেও সুমনের কথা তোলার প্রশ্নই আসে না! একটা বেকার সমবয়সী ছাত্রের কাছে মেয়ে বিয়ে দেবে — এতোটা পাগল তারা এখনও হন নি। হাসপাতাল থেকে বের হয়েই প্রথমে সুমনকে ফোন দিলাম।

– দেখা করতে পারবে? খুবই আর্জেন্ট।

সুমন আধ ঘণ্টার মাঝেই চলে এলো। আমি ডাকলে সব ছেড়ে হলেও ও ঠিকই আসবে। আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে সুমন। ওর সাথে কথা না বলে একা একা কোনো

সিদ্ধান্ত নিতে চাই না আমি।

মিতু সাথেই ছিল। সুমনের কাছে ব্যাপারটা ও-ই খুলে বললো। দেখতে পেলাম সঙ্গে সঙ্গেই ওর মুখের রঙ বদলে গেলো। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিলো সুমন। আমি একপাশে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছি। সুমন ডেকে আমাকে কাছে নিলো। খুবই আদর করে বললো, চিন্তা করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমার মুখ দিয়ে স্বগতোক্তির মতো একটা কথা বেরিয়ে এলো, “আমরা এখন কী করবো?”

– দেখো জান, বিয়ে করা এখন আমাদের জন্য ‘ওয়াইজ’ হবে না। তুমি তো জানো আমি এখনও স্টুডেন্ট, আর আংকেল-আন্টিও এখন তোমাকে বিয়ে দিবে না। তাছাড়া এখন বিয়ে করলে তোমার পড়াশোনা, ক্যারিয়ারের কী হবে! সো, আসো আমরা অব্যবহার করে ফেলি। বিয়ে হলে আমরা দুইজন রেডি হয়ে আমাদের বেবি নিবো, কেমন?

আমি সুমনের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলাম। আমাদের বাচ্চা অ্যাবোর্ট করার কথা ভেবে হঠাৎ খুব খারাপ লাগতে শুরু করলো। যদিও বুঝতে পারছি এমন দুঃখ পাওয়ার কোনো কারণই নেই। সুমন একদম প্র্যাকটিকাল কথাটাই বলেছে। আমাদের পক্ষে এখন বিয়ে করাটা অসম্ভব ব্যাপার! আর এই সমাজে এমন বাচ্চা জন্ম দেওয়ার কথা ভাবাই যায় না.. কেউ মেনে নেবে না।

আমি রাজি হলাম। মানুষের হাতে সব ইচ্ছা পূরণের ক্ষমতা সবসময় থাকে না, একটা না একটা দিকে ছাড় দিতেই হয়।

[৩]

তিনদিন পরে স্ক্যান করার জন্য হাসপাতালে এসেছি। এবার সাথে সুমনও আছে।

রিপোর্ট ঠিকঠাক থাকলে আজই অ্যাবোর্ট করে ফেলবো। কিন্তু হাসপাতালে আমার জন্য এতো বড়ো চমক অপেক্ষা করছিলো কে জানতো।

আমার রিপোর্টে দেখাচ্ছে আমি প্রায় ছ মাসের গর্ভবতী! সুমনকে সাথে দেখে নার্স ধরেই নিয়েছে যে আমরা বিবাহিত। হেসে হেসে বললো, আপনি ছয় মাসের প্রেগন্যান্ট

আর আপনি জানেনও না? খুব লাকি আপু আপনে, আমার বাচ্চা পেটে আসার সাথে সাথে এমন বমি আরম্ভ হইছিলো...

আর কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না আমি। মাথাটা ভো-ভো করছে। সুমনের দিকে তাকলাম, দেখি ওর চোখেমুখেও থমথমে ভাব। ডাক্তারের চেয়ারে গেলাম আবারও। আজকে তাকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে। আমাদেরকে বুঝিয়ে বললো, প্রেগনেন্সি এন্ড করা এখন আর সম্ভব না, বেশি দেরি হয়ে গেছে। এখন অ্যাবোরশন করলে আমি মারাও যেতে পারি।

এরপর আর কোনো কথা চলে না, তবুও সুমন যতোভাবে পারলো ডাক্তারের কাছে অনুনয়-বিনয় করে অনুরোধ করতে লাগলো। খালি পা দুইটা ধরা বাকি ছিল। কিন্তু ডাক্তার কোনোভাবেই অ্যাবোরশন করতে রাজি হলো না। এইসব ধরা পড়লে পুলিশ কেইস নিয়ে টানাটানি।

বাসায় ফিরে আমি পুরো ইন্টারনেট তন্ন-তন্ন করে ফেললাম। পড়ে যা বুঝলাম, এখন আর ওষুধ খেয়ে গর্ভপাতের সময় নেই। টাকাপয়সা দিয়ে যদি কোথাও সার্জারি করা ম্যানেজ করতেও পারি, তাহলে আমার মারা যাওয়ার সম্ভাবনাই সর্বোচ্চ। যদিও আত্মহত্যার কথা অনেকেই ভাবে, কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যু যখন এভাবে চোখের সামনে অপশন আকারে হাজির হয়, তখন সেটা সহজে বরণ করে নেওয়া যায় না। আমার সামনে বিশাল ভবিষ্যৎ পড়ে আছে! এতোদিন কষ্ট করে এই পর্যন্ত এসেছি, কতো স্বপ্ন, কতো প্রত্যাশা! বাচ্চা এখন নিবো না দেখে মারা যাবো – এই পরিণতিটা ঠিক মেনে নেওয়ার মতো না।

কিন্তু আশঙ্কা আর ভয়ে আমি অস্থির হয়ে আছি! মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করে ফেলি! মিতুকে ডাকলাম, ও আমার মাথা থেকে আত্মহত্যার কথা একেবারে ঝেড়ে ফেললো। “জোর করে অ্যাবোরশন করতে গিয়ে নিজের জীবন দিয়ে দেওয়া কোনো সমাধান হতে পারে না। সুমনও এই পরিস্থিতির জন্য ইকুয়ালি দায়ী। তুই এতো স্যাট্রিফাইস কেন করবি? তোর লাইফটা কেন নষ্ট করবি?”

আমি অসহায়ের মতো মিতুর মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম। ও বললো, “এখন বিয়েই একমাত্র পথ।”

সুমনকে বিয়ের কথা বলতেই ও বিগড়ে গেলো। কোনোদিন ও আমার সাথে রাগ করে কথা বলে নি, কিন্তু দুইদিন বিয়ের কথা বলতেই ওর নম্রতার মুখোশ কোথায় চলে গেলো! জানু, বেইবি, সুইটহার্ট ছাড়া আগে কথাই বলতে পারতো না, আর এখন অশ্রাব্য সব গালি দিয়ে কথা বলতেও বাঁধে না।

প্রথমে আমি নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, এও কি সম্ভব! আমি হয়তো নিজেকেও অবিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু সুমন যে এভাবে বদলে যাবে কোনোদিন ভাবতেও পারিনি। মিতুই ঠিক বলেছিলো, ছেলেদেরকে কোনো বিশ্বাস নেই। কিন্তু আমি সুমনের ভালোবাসায় বিশ্বাস করেছি। ওকে বিশ্বাস করে নিজের সমস্ত ওর কাছে সঁপে দিয়েছি। কখনও মনে হয় নি আমি ভুল কিছু করছি। তাহলে কি সত্যিকার ভালোবাসা বলে কিছুই নেই? আমি কি ভালোবেসে, বিশ্বাস করে ভুল করলাম? সুমন ইদানিং আমার ফোনও এভয়েড করছে। কয়েক দিন আগে ওর সাথে দেখা হয়েছিল। ও খুব ঠাণ্ডা মাথায় বলেছে, ঠিক আছে, বাচ্চা অ্যাবোর্ট করতে না পারো, জন্ম দাও, এরপর মেরে ফেলো। লাগলে বইলো, আমি কোথাও ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো....

সুমনের কথা শুনে ঘৃণায় গা রি-রি করছে। অপমানে চোখ জ্বলছে। তবুও কাঁদতে কাঁদতে মানানোর অনেক চেষ্টা করলাম। আমার দায়িত্ব নেয়ার কথা বলতেই ওর সমস্ত ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো।

একই কথা নিয়ে বারবার প্যানপ্যান করবা না। আমার ডিসিশন জানায় দিছি, এখন আমার পক্ষে বিয়ে করা পসিবল না। ইফ ইউ ওয়ান্ট উই ক্যান বি লাইক বিফোর: বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড। দ্যাটস ইট!

কতো সহজেই এসব কথা বলে দিতে পারে একটা ছেলে! অথচ একটা মেয়ে- কতো বড়ো দুর্যোগের মধ্য দিয়ে যায় সেটা কি কল্পনাও করতে পারে? আমি বুঝে ফেলেছি, এই পরীক্ষা আমার একার। সেদিন রাতটা মনে হচ্ছিলো দুঃস্বপ্নের মতো দীর্ঘ। কাঁদতে কাঁদতে চোখমুখ ফুলিয়ে ফেলেছি, শরীর-মন একদম অবসন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু এখন নিজের জন্য হলেও বাচ্চাকে জন্ম দিতে হবে। এরপর বাকি চিন্তা।

মিতুর সহযোগিতায় বনানির একটা ফ্ল্যাটে সাবলেটে ভাড়া নিলাম। ওর পরিচিত কয়েকজন সিনিয়র আপু আর জুনিয়র ছাত্রী একসাথে থাকে। বাবা-মা'কে বানিয়ে বললাম, ছাত্রী হোস্টেলে থাকতে হবে পরীক্ষার জন্য, অনেক পড়াশোনা – বাসায় বসে একা একা ম্যানেজ করতে পারছি না।

এর পরের কয়েকটা মাস গেলো বিভীষিকার মতো। জামাকাপড় ঢোলা করে বানিয়ে নিলাম, যেন পেট বোঝা না যায়। ছয় মাসের পর থেকে পেটটা আস্তে আস্তে বড়ো হচ্ছিল। আমি নিদেনপক্ষে বাইরে বেরোতাম না, পরিচিত কারো নজরে পড়তে চাই না। একান্তই বের হওয়া লাগলে গায়ের ওপর শীতে পড়ার একটা বড়ো খদ্দের চাদর জড়িয়ে নিই। বাসার আপুদেরকে মিতু আগে থেকেই সব বলে রেখেছিল। মৌমিতা আপু, রোকসানা আপা আর রাহেলা। ওরা সবাই অনেক কেয়ারিং, অনেক ফ্রেন্ডলি! আমার পাশে ওরা যেভাবে ছিল, কোনোদিনও সেই ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না! এদের মধ্যে মৌমিতা আপু আর রাহেলাই বেশি করেছে, বিশেষ করে রাহেলা। এই মেয়েটা এতো লক্ষ্মী আর হৃদয়বান! রোকসানা আপুও যখন যা পারতো করতো। কিন্তু চাকরি নিয়ে ব্যস্ততার কারণে বেশি সময় দিতে পারতো না। রাহেলা মেয়েটা বাসার বাকিদের চেয়ে আলাদা, বয়সেও আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জুনিয়র। প্রচণ্ড গরমেও দেখি কালো একটা বোরকা, নিকাব, হাতমোজা, পা মোজা ছাড়া বাইরে বেরোয় না। কে বলবে বাসার মধ্যে এই মেয়েটাই সবচেয়ে উচ্ছল! ওকে না চিনলে এরকম একটা বোরকাওয়ালি মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব করার কথা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতাম না! এতো তফাত আমাদের মধ্যে!

একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার গরম লাগে না?

– খুব লাগে!

তাহলে এতোকিছু পরে জোকার সাজো কেন?

রাহেলা হাসতে হাসতে জবাব দিলো, আল্লাহকে ভালোবাসি আপা, তাই আল্লাহর জন্য কষ্ট করতেও ভালো লাগে।

ওর উত্তরটা শুনে একটু থতমত খেয়ে গেলাম। হায় ভালোবাসা! এই ভালোবাসার জন্য আমিও কতো কী করেছি! কিন্তু রাহেলার কথায় যুক্তি আছে, ভালোবাসলে সবই করা সম্ভব। মানুষ শরীর-মন সব বিকিয়ে দেয়, আর একটা কাপড় পরা আর এমন কী। আসলেই আগে ব্যাপারটা এভাবে ভেবে দেখি নি..

প্রায় রাতেই মাঝরাত পর্যন্ত আড্ডা বসতো, সেদিনও আড্ডা বসেছে। রোকসানা আপু বললেন, আমি বাবা-মায়ের কথা ছাড়া এক পাও এদিক-সেদিক করবো না। পড়াশোনা কম্প্লিট, চাকরি পেয়েছি ব্যাস। আমার ইচ্ছা সমাপ্ত। এখন আব্বা-আম্মা যেই পাত্রের সন্ধান আনবেন, সেখানেই কবুল।

মৌমিতা আপা সবচেয়ে মডার্ন। বলে উঠলেন, সুপাত্রই যে আনবেন তার নিশ্চয়তা কী? তুমি বড্ড বেশি আইডিয়াল চাইল্ড রোকসু... আমি তো হাসানকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ের কথা ভাবতেই পারি না! আর যাকে ভালোবাসি না, তার সাথে সংসার!

ইম্পসিবল! হাসান হচ্ছেন মৌমিতা আপার ফাস্ট লাভ – পাঁচ বছরের প্রেম, এখন পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় চলছে সবকিছু। কিন্তু আমার এখন আর এইসব ফাস্ট লাভ, দীর্ঘদিনের প্রেম-ভালোবাসায় বিশ্বাস নেই। সুমনও আমার ফাস্ট লাভ ছিল, আমাদের মধ্যে কোনো সমস্যাও ছিল না। তবুও ...

চিন্তার সুতো কেটে দিয়ে রাহেলা বলে উঠলো, আপুরা আমার চিন্তাভাবনার সাথে তোমার মিল হবে না জানি। কিন্তু আমি বিয়ের পরের ভালোবাসাতেই বিশ্বাসী। যে ছেলেটা বিয়ের আগেই একটা মেয়ের সুন্দর চেহারা আর শরীর দেখে ফেলেছে, সে আসলে ঠিক কোন কারণে মেয়েটাকে ভালোবাসলো কোনো চিন্তা করতে পারো, সৌন্দর্য্য নাকি মেয়েটার মানসিকতা? তাছাড়া আমার সাথে প্রেম করার অর্থ অন্য কোনো মেয়ের সাথেও সে রিলেশন করতে পারতো, আমি বিয়ের পর তাকে কীভাবে বিশ্বাস করবো?

তাহলে তুমি বিয়েটা করবা কীভাবে? এটা তো রোকসানার মতোই হলো, অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ। বাপ-মা ধরে বেঁধে একটা গাধা এনে দিলেও মালা পরিয়ে দিবে??

মৌমিতা আপুর খোঁচাটা গায়েই মাখলো না রেহালা। উল্টো প্রশ্ন করলো, যে ছেলেটা প্রেমিক হিসেবে অসাধারণ, সে যে স্বামী হিসেবেও দায়িত্ববান হবে – এটা কীভাবে বোঝা যায় আপু? দুনিয়ার প্রত্যেকটা ছেলের সাথে এক এক করে প্রেম করে দেখা তো সম্ভব না যে কে বেশি ভালো, কাকে হাজবেন্ড হিসেবে চুজ করা উচিত। পাত্রের ব্যাপারে আল্লাহর গাইডলাইনস ফলো করবো, আমার বাবা-মা অনেক ভালো হলেও উনারা আমার মতো করে সবকিছু দেখেন না, আমি বড়োলোক কোনো ছেলেকে বিয়ে করলেই সবাই খুশি। কিন্তু আমি চাই পরহেজগার কাউকে বিয়ে করতে। তাই এখন থেকেই মসজিদের ইমাম, পরিচিত বড়ো ভাই আর বোনদেরকে বলে রেখেছি যেন

এমন কোনো পাত্রের খোঁজ পেলে আমাকে জানায়। আপু, ইসলামে ডেটিং বলে কিছু নেই, কিন্তু বিয়ের আগে জানাশোনার কথা বলা আছে। ডেটিং-এ তো আদর-আহ্লাদ ছাড়া কোনো কাজের কথা হয় না। বিয়ের জন্য যেসব প্রশ্ন জানা জরুরি, সেগুলো জানতে দুজন মিলে একাকী বন্ধ-কেবিনে হাত ধরাধরি না করলেও হয়। আমি আমার বাবার সামনে বসেও সেই প্রশ্নগুলো জেনে নিতে পারি, যেগুলোর উত্তর শুনে আমি আমার ফিউচার হাজবেন্ড বাছাই করবো।

রাহেলার কথাগুলো মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম আমি। প্রতিটা কথাই সঠিক। প্রতিটা কথাই যুক্তিসঙ্গত। অন্তরের গহীনে এসে কোথায় যেন কড়া নাড়ে।

[৫]

রাহেলা আমার ওপর বেশ প্রভাব ফেলছিল। একদিন বাইরে যাওয়ার সময় ওর থেকে চেয়ে একটা বোরকা নিলাম। মিতু, আমার বান্ধবী, মাঝে একদিন এসেছিল। আমার বোরকা ধরার কাহিনি শুনে চোখ কপালে তুলে বললো, কীরে হুজুর হয়ে গেলি নাকি? আমি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে লজ্জা পেয়ে বললাম, না, না, পেটটা বড়ো হয়ে যাচ্ছিলো। আসলে পেট বড়ো হয়ে যাওয়াটাই একমাত্র কারণ ছিল না, কিন্তু কেন যে মুখ ফসকে মিথ্যে কথাটা বের হয়ে আসলো! বাসার বাকি সদস্যরা ধরেই নিলো পেট ঢাকার জন্যই বোরকা পরে বেরোচ্ছি।

অবশ্য ওদের এই ভুল দ্রুতই ভাঙতে যাচ্ছিল...

দেখতে দেখতে ডেলিভারির দিন ঘনিয়ে আসলো। আমার মাথার মধ্যে দুঃস্বপ্নও চেপে বসতে লাগলো। কী করবো এই বাচ্চাকে নিয়ে? কোথাও ফেলে দিবো? নাকি মেরে ফেলবো? ভালোবাসার এই চিহ্ন এখন আমার জন্য অভিশাপের চিহ্নে পরিণত হয়েছে। একে কোথাও পুঁতে ফেলতে পারলে আমার শান্তি লাগতো। কিন্তু মাঝেই মাঝেই বেয়াড়া মা-বোধটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রাহেলার দেখাদেখি আমিও নামাজ ধরেছি। ফজর বাদে বাকি চার ওয়াক্ত-ই নিয়ম মতো পড়ছি। ফজরে রাহেলা ঠেলেঠুলে উঠিয়ে দেয়, ও না ডাকলে উঠতে পারিনা। গত আড়াই মাস বাসায় যাই নি, এই দুর্দিনে মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে। যদিও আমি মায়ের সাথে তেমন ক্লোজ না, তবু তো মা! আজকাল মায়ের জন্য মনটা খুব আনচান করে।

এমন বিপদের মধ্যে হঠাৎ একদিন সুমনের ফোন এলো। বেশ সাধারণ ভাবে কথা বলছিল ও। আমিও এতোদিনে নিজেকে সামলে নিয়েছি। আগের মতো কান্নাকাটি আর করলাম না, নিজেকে আর কতোই বা নিচু করবো। শীতল স্বরে শুধু বললাম, বলো কী বলবে। আমার গলার আওয়াজেই বোধ হয়, ও বেশি কিছু বলার সাহস করতে পারলো না। শুধু বললো, যদি কোনো দরকার হয় ডেকো। আমার পরিচিত এতিমখানার লোক আছে, সে ব্যবস্থা করতে পারবে। যদিও আমাদের জন্য এই বাচ্চার কোনো সাইন না রাখাটাই বেস্ট।

আমার মাথায় ধাই করে রক্ত চড়ে গেলো। কতো বড়ো দুঃসাহস যে আমাদের কথা বলতে এসেছে। দায়িত্ব নেবে না, আবার দেখাতে এসেছে সে আমাদের ব্যাপারে কতোই না চিন্তিত! কী পেয়েছে এই পশুটা? আমার বাচ্চার কোনো দায়িত্ব তো নেয়ই নি, এখন এসেছে আমার বাচ্চাকে খুন করতে! তোমার থেকে আমি কোনো অ্যাডভাইস চাই নি, বলে মুখের ওপর ফোনটা খট করে কেটে দিলাম।

এতোদিন মনের মধ্যে যা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল এখন সেটাও দূর হয়ে গেলো। এই বাচ্চা আমার বাচ্চা। ওকে আমি মেরে ফেলতে পারি না, না-না-না। আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। এই শিশুকে মেরে ফেলা হবে ঘোরতর পাপ। এক গুনাহর ভার এখনও বইছি, সন্তান-হত্যা করে আরেকটা জঘন্যতম অপরাধের ভাগীদার আমি হতে চাই না। কিন্তু কোথায় যাবো এই শিশু নিয়ে, কী করবো? বাবা-মায়ের সামনে কী জবাব দেবো? মিতু, রাহেলা, রোকসানা আপু, কেউই সন্তোষজনক কোনো সমাধান দিতে পারলো না। জীবনের এক একটা পর্যায় এতো জটিল, যার সমাধান কোনো মানুষের কাছেই থাকে না। রাহেলা শুধু বললো, আপা, দুয়া করেন। আপনি আল্লাহর দিকে পা বাড়াইসেন, আল্লাহ আপনাকে কখনও ফেলে দিবে না।

আমি শুধু দুয়াই করলাম। ফজরের নামাজ এখন নিয়মিত পড়ি। রাতের বেলা ঘুমও আসতে চায় না এখন আর, তীব্র ব্যাকপেইন আর মাথাব্যথা নিয়ে জেগেই থাকা হয়। ভোর রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদি আর আল্লাহর দরবারে দুয়া চাই। বাচ্চাটাকে মারতে চাই না ইয়া আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য উত্তম ব্যবস্থা করে দাও। ঘুরেফিরে এই একই দুয়া পাগলের মতো চাইতে থাকি...

আমার পরিবর্তন দেখে ধীরে ধীরে সবাই বুঝে যাচ্ছিলো যে আমি সাময়িক বোরকা ধরি নি, আসলেই বদলে গেছি। আরও পরিষ্কার হলো যখন দেখলো আমি কিছুতেই পুরুষ ডাক্তারের কাছে অপারেশন করাতে রাজি নই! মিতু তার চিরাচরিত স্বভাবমত একটা লম্বা ঝাড়ি দিয়ে বললো, মরতে চাস নাকি? বয়স্ফেন্ডের সাথে রাত কাটাতে খারাপ লাগলো না, ডাক্তারের কাছে অপারেশন করাতে যতো লজ্জা।

মিতুটার মুখে কিছুই বাধে না। আমি দাঁতমুখ চেপে বললাম, দ্যাখ, সবকিছু মিলাস না। আগে এতো মেনে চলতাম না। পুরুষ ডাক্তারের কাছেও অপারেশন করবো যদি আর কোনো অপশন না থাকে। কিন্তু মহিলা ডাক্তারের খোঁজ করতে তো আর সমস্যা নেই। তুই পারলে আমাকে হেল্প কর-এতো ক্যানক্যান করিস না।

মিতু ঠোটকাটা হলেও অবিবেচক না। আমাকে আর বেশি ঘাটালো না।

বললো, চল ঘুরতে যাই। উদ্দেশ্য শপিং! বাচ্চা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকে এখন মনটা বেশ ভারমুক্ত লাগে। শখও হয় অনেক রকমের। কিন্তু ভারি শরীর নিয়ে বেরোনো হয় না। মিতুই আমাকে টেনে বের করলো ঘর থেকে। ছোট্ট সোনার জন্য ফিডার, জামা, জুতো, একটা ছোট্ট বালিশ, কয়েক প্যাকেট ডাইপার, আর রেডিমেড কাঁথা কিনে আনলাম। সেই দিনটা কী যে ভালো লাগছিলো! মা হওয়ার ব্যাপারটা যে এতো আনন্দদায়ক এতোদিন উপভোগই করতে পারি নি। শুধু দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনা আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিলো। কিন্তু এখন চিন্তা হলেই মনে মনে বলি, “হাসবি আল্লাহ্ ওয়া নি’মাল ওয়াকীল” আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, এরচেয়ে মন ভালো করা কথা আর আছে কোথাও?

ডিউ ডেইটের প্রায় তিন সপ্তাহ আগেই আমার ব্যথা শুরু হয়ে গেলো। অস্বাভাবিক ব্যথা! আমাকে দৌড়ে ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গেলো রাহেলা আর রোকসানা আপু। মিতুও এলো কিছুক্ষণের মধ্যে। মাঝের পুরো তিন ঘণ্টা আমার কোনো হুঁশ ছিল না।

হুঁশ ফিরে শুনলাম, আমার ডেলিভারি হয়ে গেছে। জ্ঞান ছিল না, তাই সিজার করে বাচ্চা বের করা লেগেছে। আর সবচেয়ে আকস্মিক, সবচেয়ে ভয়ংকর, সবচেয়ে

যন্ত্রণাদায়ক খবরটা আমাকে ঠিক তখনই দেওয়া হলো। আমার বাচ্চাটা মারা গেছে।
ব্রেইন হ্যামারেজের কারণে ডেলিভারির সময়ই ও মারা যায়।
আমি জমে গেলাম। অপ্রত্যাশিত হলেও বাচ্চাটাকে নিয়ে শেষপর্যন্ত অনেক স্বপ্ন
দেখেছিলাম। সব প্রতিকূলতার মধ্যে ওকে জন্ম দিয়েছি, পুরো পৃথিবীর সাথে যুদ্ধ করে
হলেও ওকে ভালোমত বড়ো করতে চেয়েছি। আমার মনের কুঠিরে জায়গা করে
নিয়েছিল পাখিটা। চলে গেলো এভাবে? আমাকে একা ফেলে রেখে? খুব কষ্ট হলো,
এই কষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তীক্ষ্ণ একটা বেদনা আমাকে চিরে ফেললো।
অথচ অদ্ভুত পৃথিবী, এই ভয়ঙ্কর দুঃসময়ে কয়েকটা অবিবাহিত মেয়ে ছাড়া আমার
পাশে আর কেউই নেই। এরা কী বুঝবে আমার কষ্ট! ছাদের দিকে চোখ চলে গেলো।
আল্লাহকে ডেকে বললাম, হে আল্লাহ তুমিই সবচেয়ে উত্তম অভিভাবক। আমার
বাচ্চাটাকে তুমি দেখে রেখো।

[৭]

রাস্তার ধারের কোনো ডাস্টবিনে না, নর্দমার বর্জ্যতে না, টয়লেটে ফ্লাশ করেও না—
আমার সন্তানকে আমি সবচেয়ে সুন্দরভাবে বিদায় জানালাম। হুজুর ডেকে ওর দাফন
সম্পন্ন হলো, আমি বাদে বাকিরা সবাই নামাজ পড়লো। যে শিশুর মৃত্যু লেখা আছে,
সে মারা যাবেই। বাবা-মা হয়ে নিজের হাতে সন্তানকে খুন করা তো জানোয়ারও পারে
না। আর মানুষ শরীরের ক্ষুধা, প্রেমের তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে শেষমেশ সেটাই করে...
এক সপ্তাহ হাসপাতালে থাকার পর আমি বাসায় ফিরে গেলাম। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত
হওয়ার কারণে রিকাবার করতে অনেক সময় লাগছিল। বাসা থেকে মিতু বুদ্ধি করে
আগেই বাচ্চার জিনিসগুলো সরিয়ে ফেলেছে। যেন আমার চোখে পড়লে আমি দুঃখ না
পাই, অবশ্য এতেকিছুর দরকার ছিল না। আমি আল্লাহর ওপর ভরসা রাখি আর
আল্লাহকে মেনে চলি। এখন আমার সাথে যেটাই হোক, আমি আর ভয় পাই না।
ভেঙেও পড়ি না। রোকসানা আপু বদলি হয়ে গেছেন শুনলাম, আমারও এই বাসা
থেকে বেরোনোর সময় হয়ে গেছে। নিজের বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যেতে হবে
এবার...

মনে হলো যেন একটা যুদ্ধ শেষ হলো। কিন্তু ফিরতে হলো খালি হাতে। আসলে খালি হাতে না, হাতে ইসলামের আলো নিয়ে ফিরছি – এটাই তো সবচেয়ে বড়ো পাওয়া! বাসায় বাবা-মা আমাকে প্রায় তিন মাস পর দেখছেন। আমার পরিবর্তনে খুব হতবাক সবাই। যেন আমাকে চিনতে পারছে না কেউ।

এর প্রায় দুই মাস পরে হঠাৎ একদিন সুমন ফোন দিয়েছিল। গলা শুনে মনে হলো যেন খুব কান্নাকাটি করেছে। ভেক ভেক করে হেঁচকি তুলে আমাকে বললো, সে ‘মেইক আপ’ করতে চায়! যতো সব ভগ্নামি। পুরো প্রেগন্যান্সির সময় আমাকে মাঝ সমুদ্রে ফেলে দিয়ে এখন এসেছে আবার আমার শরীর এনজয় করতে! মানুষই পারে এতোটা নির্লজ্জ হতে।

আজ ভাবছিলাম, আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন। পৃথিবীর প্রতিটা ঘটনার পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে। এক একটা পরিস্থিতি তৈরি করে তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর কাছে আসার সুযোগ করে দেন। কেউ সেই সুযোগটা কাজে লাগায়, আর কেউ ছুঁড়ে ফেলে। প্রথমে বাচ্চা রাখার কোনো ইচ্ছাই ছিল না, অথচ বাচ্চা জন্ম দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিল না। এরপর আল্লাহর ভয়ে বাচ্চাটা রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। তখন আল্লাহ অন্য ইচ্ছা করলেন। আর একদিক থেকে ভাবলে এভাবেই আল্লাহ আমাকে বেইজ্জত হওয়া থেকে রক্ষা করলেন। মাঝখান দিয়ে সুমন আর সুমনের মতো সব ছেলের চেহারা স্পষ্ট করে দিলেন। বিয়ের আগে প্রেমগুলো কতো সস্তা, কতো ঠুনকো, কতো মেকি! অথচ ছেলেমেয়েরা অন্ধের মতো এর পিছেই ছুটতে থাকে...

মিতু এখনও আগের মতোই আছে। কিছু মানুষ কখনোই শিক্ষা নেয় না। আমার এতো বড়ো ঘটনার পরেও ও ঠিক আগের মতো রয়ে গেলো। ছেলে ঘুরিয়ে মজা নিচ্ছে। খোলামেলা ঘুরে বেড়াচ্ছে। যখন যার সাথে ইচ্ছা শুয়ে পড়ছে। ওর সাথে আগের মতো আর মিশতে পারিনা, বন্ধুত্ব আছে কিন্তু অশ্লীল রসিকতা নেই। ছেলেদের সাথে বসে আড্ডা দেই না দেখে দেখাসাক্ষাতও কম হয়। রোকসানা আপুর খবর অনেকদিন জানিনা। তবে মৌমিতা আপুর কথা মিতুর মুখেই শুনেছি, পাঁচ বছরের সেই ফাস্ট লাভকে ছেড়ে তিনি কানাডার আরও উচ্চশিক্ষিত এক পাত্রকে বিয়ে করে এখন কানাডায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। হায়রে ফাস্ট লাভ! হায়রে মরার প্রেম!

রাহেলার সাথে বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়েছে। যদিও ও আমার ছোটবোনের মতো। সামনের মাসে ওর বিয়ে। ছেলে ছাত্র, একই সাথে ব্যবসাও করছে। কম বয়সেই বিয়ে করতে চায়, রাহেলার দ্বীনদারিতা দেখে ওকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। রাহেলা বলে, একবার বিয়েটা করি, এরপর বরের সাথে মিলে তোর ঘটকালি করবো... হি হি। আমি অনেক বদলে গেছি। অ-নে-ক। এখন রাহেলার মতোই হাত মোজা-পা মোজা পরি। দূর থেকে দেখে একদিন মিতু বলেছিল, তোকে দেখে ভেবেছি রাহেলা কী করে এইখানে! সো কনফিউজিং!

আমি মনে মনে হাসি। আব্বাহ আমাকে অনেক দিলেন। এক জীবনে আব্বাহকে খুঁজে পেলে আর কী চাওয়ার থাকতে পারে...

স্বপ্নপুরুষ

বিনতে হক

১.

মুনিরাদের ভার্টিসটির ক্যান্টিনে কয়েকদিন ধরে সবচেয়ে মুখরোচক যে বিষয়টি নিয়ে আলাপ হচ্ছে, তা হল “আবরার স্যার”। সদ্য আমেরিকা ফেরত ইয়াং, আনম্যারেড এই স্যার কে ঘিরে মেয়েদের আগ্রহের শেষ নেই। প্রচুর মেয়ে তার জন্য ইতোমধ্যে দিওয়ানা হয়ে গিয়েছে।

একজন স্যারের জন্য মানুষ কিভাবে দিওয়ানা হয়, তা ভাবতেও অবাক লাগে মুনিরার। এই সেমিস্টারে তাদের একটি ক্লাস নেবেন এই ভদ্রলোক। ক্লাসের বাঁধন তো আগে থেকেই এই লোকের জন্য ফিঁদা। তাই এ সেমিস্টারে স্যার কেন মাত্র একটি সাবজেক্টের ক্লাস নেবেন, সবগুলো সাবজেক্ট নেবেন না, এই ব্যাপারে তাকে বেশ দুঃখিত মনে হচ্ছে।

ওদের ক্লাসে ওরা অল্প কিছু মেয়ে, তাই ক্লাসের ছেলেরা সব সময়েই বেশ আগ্রহ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে, কোন স্যার কোন মেয়ের দিকে বেশিক্ষণ তাকাচ্ছে। আর স্যার চলে গেলেই এই নিয়ে তাদের ক্ষ্যাপানো শুরু হয়ে যায়।

এবার কি হবে ভাবতেই মুনিরার হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছে, বাঁধন এমনতেই স্যারের জন্য পাগল, ক্লাসের ছেলেরা টের পেলে খবর হয়ে যাবে। টিচার্স রুমে ব্যাপারটা পৌঁছলে খুবই লজ্জাজনক হবে।

অতএব বাঁধনকে চোখে চোখে রাখতে হবে। তাছাড়া ওই স্যারের কথা চিন্তা করেও সে অবাক হলো। সব মেয়েরা কেনো তার জন্য এমন করে, সে কি এমন আহামরি হতে পারে, মুনিরা ভেবে পেলো না।

২.

প্রথম ক্লাসে সবাই শিক্ষক আসার অপেক্ষায় আছে, ক্লাসের সব মেয়েরা আজ বেশ সাজগোজ করে এসেছে। এদের মাঝে মুনিরাই একমাত্র মাথায় কাপড় দিয়ে সাধারণ বেশভূষায় আছে।

স্যার ক্লাসে এলেন, বু জিলের ওপর একটা সাদা শার্ট পড়ে, দেখতে তেমন বিশেষ কিছু মনে হলো না মুনিরার। তাছাড়া পুরো সময়েই তিনি বেশ ব্যক্তিত্ব নিয়ে গম্ভীর ভাবে

রইলেন। মেয়েদের সাথে পারতপক্ষে কথা বললেন না। ক্লাসের মাঝে মুনিরাকে দাঁড় করিয়ে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, সে খতমত খেয়ে যাওয়ায় একরকম অপমানই করলেন বলা যায়।

ক্লাস শেষে চূড়ান্ত মেজাজ খারাপ নিয়ে বের হলো মুনিরা, প্রায় রেগে গিয়ে বাঁধনকে বললো, “এই তোর বিখ্যাত স্যার? অহেতুক এতো মানুষের সামনে অপমান করলো আমাকে! জানি তো, এইসব আমেরিকা ফেরত মানুষের হিজাব পড়া মেয়ে দেখলেই জ্বলুনি গুরু হয়ে যায়, অহেতুক তাদের পেছনে লাগে তখন”।

বাঁধন মিটিমিটি হেসে বললো “,আমার তো কাহিনী অন্যরকম মনে হচ্ছে, স্যার তোর দিকে কিভাবে তাকিয়ে ছিলো, দেখিস নি?”

“ফালতু কথা বলবি না তো! তোর মাথায় এইসব গোবর ভরা আইডিয়া ছাড়া কি আর কিছুই নেই?”

সেদিন মুনিরা বাসায় এসে অনেক্ষণ কাঁদলো ও এই দীর্ঘ চার মাসের সেমিস্টার কিভাবে কাটাতে তা নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো। যদিও সে তখনো জানতো না, এ লোকের সাথে তার জীবন জড়িয়ে গিয়ে, কি অদ্ভুত পরিস্থিতির স্বীকার হবে সে। যদি কল্পনাও করতে পারতো, নির্ঘাত সেদিনই সাবজেক্ট ড্রপ করে ফেলতো।

এভাবে দু এক সপ্তাহ চলে গেলো। স্যার আজকাল ক্লাসে এসে অনেক গল্প করেন, তার দেশ বিদেশের ঘোরাঘুরির অভিজ্ঞতা মিলিয়ে মিশিয়ে, রিয়েল লাইফ উদাহরণ দিয়ে যথেষ্ট আকর্ষণীয় করেই মার্কেটিং পড়ান।

আজকাল আর মুনিরাকে অপমান করেন না, কিন্তু মেয়েদের কে মনে হয় প্রশ্ন একটু বেশিই করেন। বাঁধন আর মুনিরাকে সব চেয়ে বেশী করেন। যাই হোক, এখন স্যারকে আর অত অমানবিক লাগে না মুনিরার।

এর মাঝে এক দিন ক্লাস শেষে দুপুরে বাসায় ফিরে বেশ বড় ধরনের একটা ঝটকা খেলো সে। ভাত খাওয়ার পর, মা তাকে নিয়ে বসলো। বললো, “তোদের ভার্শিটি তে আবরার নামের কেও পড়ায়?”

মুনিরা মোটামোটি আকাশ থেকে পড়ে বললো “,হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কি করে জানো মা?”

“তোর ভার্শিটির সিনিয়র একজন শিক্ষক, অভিভাবকের নাম্বারের লিস্ট থেকে নাম্বার নিয়ে তোরা বাবার কাছে ফোন দিয়েছেন, ফোন দিয়ে বলেছেন, আবরার নামের এক স্যার পারিবারিক ভাবে তোরা জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে চান।

এ ব্যাপারে তোর মত জানতে চাচ্ছি। আমি আসলে ভাবতে পারছি না, শিক্ষক হয়ে কিভাবে কোন মানুষ স্টুডেন্ট এর জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়! তোর সাথে ডাইরেক্ট কিছু বলেছে? তোদের মাঝে কোন সম্পর্ক নেই তো? সত্য কথা বল।”

“মা, কি বলো এসব? তোমার মেয়ে কখনো তোমাদের বিশ্বাস ভাংবে না। আর এই লোক কে তোমরা মানা করে দাও।” প্রায় কেঁদে ফেললো মুনিরা। ক্লাসের এতো মেয়ে যার জন্য পাগল হয়ে আছে, এমন ব্যক্তিকে বিয়ে করার কোন শখ নেই ওর। কিন্তু এ কথা তো আর মা কে বলা যাচ্ছে না।

পরদিন সকালে ক্লাসে যাবার সময় মুনিরার মনে হচ্ছিলো, সে লজ্জায় ও মরমে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। যে মানুষ তার জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে, তার ক্লাস কিভাবে করবে? আবার না করেও উপায় নেই। একে তো সামনে মিড টার্ম, তার ওপর বাঁধনটা বিরাট বুদ্ধিমতি, দু মিনিটে ওর পেট থেকে আসল কথা বের করে ফেলবে। তখন আরো লজ্জার হবে ব্যাপারটা!

এই প্রথমবারের মতো ওর মনে হলো, ইশ, হিজাবের সাথে যদি বোরকাও পড়তো, তাহলে হয়তো এই মুসিবতে তাকে পড়তে হতো না। বোরকাওয়ালা কারো জন্য নিশ্চয় কোন স্যার বাসায় প্রস্তাব পাঠাতো না!

ক্লাসের চল্লিশ মিনিট, চল্লিশ ঘণ্টার মতো মনে হলো মুনিরার। ঘেমে নেয়ে অস্থির হয়ে গেলো। কিন্তু স্যার আজ ওকে কোন প্রশ্নও করলেন না, ওর দিকে তাকালেনও না, যেনো ওর কোন অস্তিত্বই নেই। ক্লাস শেষে মুনিরার ঘাম দিয়ে যেনো জ্বর ছাড়লো আর মনের গহীনে আবরার সাহেবের প্রতি কিছুটা কৃতজ্ঞতাও অনুভব করলো, সবার সামনে কোন ওলোট পালট কথা না বলার জন্য।

এভাবে বেশ কয়েকদিন গেলো, বাসায় কেও আর এই বিষয়ে কোন কথা বললো না, স্যারও এমন ব্যবহার করে যেতে লাগলেন, যেন মুনিরা একজন অদৃশ্য মানবী।

৩.

হঠাত একদিন বিকেলে মা আবার কামরায় এলেন। আর ঘোষণা দিলেন, তোর বাবার ইমেলে ঐ সিনিয়র শিক্ষক (যিনি ঘটকালি করছেন) আবরারের বায়ো ডেটা পাঠিয়েছেন। আমাদের বেশ ভালো লেগেছে, আমরা খোঁজ খবর নিয়ে দেখবো। সব যদি ভালো হয়, তাহলে এমন সম্বন্ধ হেলায় হারাতে চাই না।”

মুনিরার আজ প্রথম দিনের মতো অতো খারাপ লাগলো না, এ ক’দিন স্যারের মার্জিত ব্যবহারে তার মনটাও কিছুটা অনুকূলে হাওয়া দিচ্ছে। বিয়ে তো এক সময় করতেই হবে। মা বাবা পছন্দ করলে সে আর আপত্তি করবে না।

সেদিন সন্ধ্যায় অচেনা নাম্বার থেকে ফোন এলো।

“হ্যালো, মুনিরা আছে?”

-জী বলছি।

-আমি আবরার, আপনার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি?

প্রথম মুনিরা কিছুটা আড়ষ্ট বোধ করলেও, একসময় তার নিজেরো ভালো লাগতে লাগলো। জীবনে কোন ছেলের সাথে সম্পর্কতে না জড়ানোর বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ওর মনে হতে লাগলো, ও তো প্রেম করছে না। বাবা মার অমতে তো কিছু করছে না। আর ধর্ম নিশ্চয় অতো কঠিন নয়, বিয়ের নিয়তে একটু জ্ঞানশোনা হলে ক্ষতি কি!

এভাবে প্রেম বিরোধী মুনিরাও ধীরে ধীরে অদ্ভুত এক জালে জড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। আবরার তাকে বোঝালো ক্লাসে কারো সাথে এ বিষয় শেয়ার না করতে, বিশেষ করে বাঁধন কে কিছু না বলতে, কারণ এই মেয়ে, এমন মজাদার খবর পেলে মুহূর্তে সারা দুনিয়া রাষ্ট্র করে দেবে।

দু/তিন দিন কথা বলার পর মুনিরার মনের গভীর থেকে কোথায় যেনো খুঁতখুঁত করতে লাগলো তার বার বার মনে হতে লাগলো কিছু একটা ভুল হচ্ছে কোথাও। কারন যতবার আবরার কে বলে দু পরিবারের দেখা করিয়ে দিতে, ততবার সে নানা ছল ছুতোয় এড়িয়ে যাচ্ছিলো। কখনো তার দাদীর অসুখ আবার কখনো বোনের পরীক্ষা ইত্যাদি নানা অজুহাত দেখাতে লাগলো।

কয়েকদিন এভাবে যাবার পর, একদিন আবরার তাকে প্রস্তাব দিলো, “চলো আমরা ডেটিং এ যাই, একসাথে লাঞ্চ করবো। এভাবে একে অপরকে আরো ভালো ভাবে জানতে পারবো।”

এবার মুনিরার আসল স্বহৃদটি যেনো জেগে উঠলো, সেই স্বহৃদ বার বার তাকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করতে লাগলো। হঠাত তার মনে হলো, বিয়ে তো এখনো হয় নি, সে কেনো একটি ছেলের সাথে কথা বলছে? ও কি অনুধাবন করতে পারছে না, কি পরিমাণ গুনাহের সাগরে ডুবে যাচ্ছে দিনে দিনে? যেখানে কথা বলাও পাপ, সেখানে দেখা করতে যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

অতএব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো, সে দেখা করতে তো যাবেই না, বরং ফোনেও আর কথা বলবে না। যতই কষ্ট হোক, মানুষটার প্রতি যতই টান অনুভব করুক না কেন, আল্লাহ্ এর ভয়ে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য হলেও তাকে এ সম্পর্ক থেকে সরে আসতে হবে।

যদি ভাগ্যে থাকে, বিয়ে হবে। তা না হলে সবর করবে।

সেদিনই সে মা কে দিয়ে জানিয়ে দিলো, যদি আবরার তাকে সত্যিই বিয়ে করতে চায়, তবে যেন পুরোপুরি পারিবারিক ভাবে আসে, আলাদা করে যেনো যোগাযোগ না করে।

8.

এরপরের ঘটনাগুলো বেশ দ্রুত ঘটে গেলো। আবরার তার পরিবার নিয়ে আর এলো না। বোঝা গেলো, শুধু প্রেম করা আর ঘুরে ফিরে বেড়ানোতেই তার আগ্রহ সীমাবদ্ধ ছিলো। বিয়ের প্রস্তাব ছিলো মুনিরা পর্যন্ত পৌঁছানোর ছুতো মাত্র। উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সে সিনিয়র একজন শিক্ষক কে জড়াতেও দ্বিধা করে নি।

ঘটনা এখানে থেমে গেলেই ভালো হতো। কিন্তু আরো অনেক কিছু দেখার ছিলো ভাগ্যে। কিছুদিনের মাঝে আবিষ্কার হলো, এই লোক মুনিরা, বাঁধন এবং অন্যান্য ক্লাসের বুশরা ও নায়লা নামের আরো দু'জন মেয়ের সাথে একইসাথে ফোনে কথা বলতো। তাদের সাথে ঘুরে বেড়াতো, ডেটিং এ যেতো। একজন মেয়ের সাথে অনেকদিন আনন্দ করার পর, তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য মেয়ের সাথে জড়াতো।

সব মেয়েদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতো, কিন্তু মুনিরাকে কিছুতেই বাগে আনতে না পেরে, বিয়ের প্রস্তাবের নাটক সাজিয়েছিলো!

এর মাঝে বাবা খবর আনলেন, আবরার স্যারের দেয়া বায়োডেটায় মিথ্যার ছড়াছড়ি। তার পরিবারের নাম ঠিকানায় খোঁজ নিয়ে কাওকে পাওয়া যায় নি।

মুনিরা যতো এসব শুনতে লাগলো, ততই তার আতংকে গলা শুকিয়ে যেতে লাগলো। আল্লাহ্ তাকে কত ভয়ংকর ফাঁদ থেকে বাঁচিয়েছেন, ভেবে হৃদয়টা কৃতজ্ঞতায় ভরে গেলো।

চার/পাঁচ দিন কথা বলার পরই বিবেকের দংশনে সে সরে এসেছিলো, তা না হলে অন্য মেয়েদের মতো ব্যবহৃত হবার পর মুখ থুবড়ে পড়তে হতো তাকেও।

ভাগ্যিস আল্লাহ্ এর শাস্তির ভয় অন্তরে দৃঢ় ভাবে গেঁথে ছিলো, ফলে অপমানিত হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেলো ও।

পরবর্তীতে আবরার স্যারের কীর্তীকলাপ জানাজানি হবার পর ভাসিটি কর্তৃপক্ষ তাকে বহিষ্কার করেছিলো।

কিন্তু এক আবরার ধরা পড়লেও, প্রতিনিয়ত কত শত আবরার মেয়েদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। অভিভাবকেরা যদি কিছুটা সচেতন হতো আর মেয়েরাও যদি অনৈতিক বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতো, তাহলে বুশরা, নায়লাদের মতো মেয়েরা বেঁচে যেতো এসব মিথ্যায় জড়ানো ‘স্বপ্নপুরুষ’ দের কালো থাবা থেকে।

পুনরাবৃত্তি

উম্মু আসাদুল্লাহ

সায়মার ঘরে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন আমেনা। দরজার বাইরে থেকেই সায়মাকে দেখা যাচ্ছে। মেয়েটা পেটে হাত রেখে কাঁদছে। আমেনার বড় ছেলের বউ সায়মা। মেয়েটা সাড়ে সাত মাসের প্রেগন্যান্ট। সায়মার দিকে তাকিয়ে আমেনার ২৫ বছর আগের স্মৃতি হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

আমেনাও সায়মার মত বিয়ের পরপর অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। অনেক অসুস্থ থাকতেন পুরো সময়টা। ঠিক এমন সাড়ে সাত মাসে তার পেটে বাচ্চার নড়াচড়া খুব কমে গিয়েছিল। একবার হসপিটালে ভর্তিও থাকতে হয়েছিল। অক্সিজেন দিলে বাবু নড়ে, কিন্তু বাসায় আসলে ২/৩ দিনে নড়াচড়া কমে যায়।

সেদিনের কথা আমেনার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। সারারাত বাচ্চাটা নড়েনি। ডাক্তারের সাথে কথা বলার পর তিনি বলেছিলেন যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যেতে, অবস্থা খারাপ হলে ইমার্জেন্সি সিজার করতে হতে পারে। আমেনার হাসবেস্ত তখন অফিসে। তিনি দৌড়ে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার শাশুড়িকে খবরটা দিয়েছিলেন। রুমে এসে ব্যাগ গুছানোর সময় শাশুড়ি ঘরে এসে ঢুকলেন।

এসেই বললেন“ ,তাহলে, বাচ্চাটাকে তুমি এতো আগে বের করে ফেলতে চাচ্ছো??”
আমেনা অনেক বড় ধাক্কা খেলেন এই কথা শুনে। তিনি অবাক হয়ে শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু তার মনেহয় সেদিকে খেয়াল ছিল না। তিনি বলতেই লাগলেন, “আরো কয়েকদিন বাচ্চাটা পেটে রাখলে কি হতো? পেট থেকেই বাচ্চাটা হুপ্তপুপ্ত হয়ে বের হতো, এতো আগে বের করলে ইনকিউবেটরে রাখা লাগবে। কত খরচ! এতো টাকা কোথেকে আসবে??”

আমেনার রাগে দুঃখে সমস্ত শরীর কাঁপছিল! তিনি কি নিজের ইচ্ছায় বাচ্চার নড়াচড়া কমিয়েছেন!! তাও তিনি বোঝানোর চেষ্টা করতে গেলেন, “আম্মা বাবুর নড়াচড়া কম, অক্সিজেনের অভাব...”

পুরো কথা শেষ করার আগেই তিনি রাগের সাথে বলে উঠলেন“ ,বাচ্চাকে তো সেবার অক্সিজেন দিয়ে তুমিই নষ্ট করেছ, এখন অক্সিজেন ছাড়া আর নড়তেই চায়না। এখন আবার সময়ের আগেই পেট থেকে বের করে ফেলতে চাইছো! আরো দুই সপ্তাহ পেটে

রাখলে কি হয়? ডাক্তাররা তো কত কিছুই বলে,তাই বলে তোমাকেও বাচ্চা বের করে ফেলতে হবে নাকি??"

আমেনার এখনো মনে আছে সেদিন তিনি কতটা কষ্ট পেয়েছিলেন। একটা বাচ্চা পেটে রাখা, প্রতিটা মুহূর্ত বাচ্চাকে অনুভব করা, বাচ্চার কষ্ট হচ্ছে কিনা ভেবে রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে থাকা, এতো অসুস্থ থাকার পরেও বাচ্চার কথা ভেবে খুশি মনে সব কষ্ট মেনে নেওয়া – যে বাচ্চাকে চোখে দেখেনি সেই সন্তানের প্রতি কী পরিমাণ মায়া জন্মায় তা তো আরেকজন মায়েরই বুঝার কথা। কেউ কি চায় তার বাচ্চাটার সময়ের আগে জন্ম হোক? নাকে অক্সিজেন, মুখে নল, হাতে ক্যানোলা থাকুক?? তারপরেও তো বাচ্চার প্রয়োজনে এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

ভাবতে ভাবতে আমেনার চোখে কখন পানি চলে এসেছে তিনি নিজেও বুঝতে পারলেন না। নাহ এবার তিনি ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেবেন না। তিনি সায়েমার ঘরে ঢুকে মেয়েটার মাথায় হাত রেখে বললেন“ ,কী হয়েছে মা, তোমার মন খারাপ কেন?”

বিয়ের নয় মাস হয়ে গেছে, সায়েমা এতোদিনেও শাশুড়ির সাথে সহজ হতে পারেনি। কিন্তু আমেনার এই ভালোবাসার সামান্য মা ডাকে সব ব্যবধান, মনোমালিন্য আজ মুছে গেল। সায়েমা আমেনাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল, “মা বাবু না কাল সন্ধ্যা থেকে নড়ছেন। খুবই সামান্য টের পাই।”

আমেনা সায়েমার চোখ মুছে দিয়ে বললেন“ ,চিন্তা করো না মা, হায়াতের মালিক আল্লাহ। দুই রাকাত নফল সালাত পড়ে প্রস্তুত হও, আমি তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। তুমি দুশ্চিন্তা করলে বাচ্চার ক্ষতি হবে। আল্লাহর উপর ভরসা রাখো মা। আল্লাহর কাছে চাও সালাতের মাধ্যমে।”

সায়মা চোখ মুছে আমেনার দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকালো। সে দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা, সম্মান, ভরসা সব ছিলো। সায়মা অজু করতে চলে যাওয়ার পর আমেনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সামান্য একটা কথা, একটু সহানুভূতি যে জীবনের জটিলতা কত দূর করে দিতে পারে তা যদি সবাই বুঝতো!

আমেনার সেবার সিজার করা লাগেনি, বাচ্চা সঠিক সময়েই হয়েছিল আল্লাহর ইচ্ছায়। কিন্তু সেই দিনের পাওয়া কষ্টটা আজও আমেনার চোখ ভিজিয়ে দেয়। এই চোখের পানির ভার কি বহন করার ক্ষমতা আখিরাতে থাকবে জুলুমকারীর?

“ধমুকজ ম্যাট্রিমনি”

আফিফা আবেদীন সাওদা

ধমুকজ ম্যাট্রিমনির খুব অল্পদিনেই নামডাক হয়েছে। প্রতিদিন তাদের সাইটে হাজার হাজার বায়োডাটা পড়ে। এক মাসে তারা গড়ে ১০০ টা বিয়ে দেয়।

তাদের ফেসবুক পেইজে রিভিউ খুবই ভাল। অনেকেরই বিয়ে হচ্ছিল না, কিন্তু ধমুকজে বায়োডাটা দেয়ার এক সপ্তাহের মাথায় তারা বিয়ে করে সুখী জীবন যাপন করছে।

পাড়ার ঘটক আন্টিকে বায়োডাটা দিয়ে সাড়া না পাওয়া আঙ্গুরি তার বান্ধবীর পরামর্শে একদিন ধমুকজে বায়োডাটা দিল। ঐদিনই ঠিক একই সময়ে সদ্য চাকরিতে জয়েন করা রুবেল নিজের বায়োডাটা সাবমিট করল।

গল্পের শুরু এখানেই। আঙ্গুরি আর রুবেলের অসম্ভব বিয়েকে ধমুকজ সম্ভব করল মাত্র ৫ দিনে !

★প্রথম দিন★

বায়োডাটা দেয়ার পর আঙ্গুরি আর রুবেল সারাদিন নিজেদের মেইল আইডিতে সাইন ইন করে বসেছিল। ধমুকজ থেকে একটা থ্যাক্স ইউ মেসেজ এসেছে। আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। দুজনের দিন কাটল অস্থিরতায়।

★দ্বিতীয় দিন★

ধমুকজ থেকে মেইল পেয়েছে আঙ্গুরি। ওরা একটা বায়োডাটা পাঠিয়েছে। আজ বিকেলের মধ্যে জানাতে হবে ছেলে পছন্দ হয়েছে কিনা। ছেলের নাম রুবেল। আঙ্গুরির বায়োডাটা পছন্দ হয়নি। মেইল করে সে জানিয়ে দিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর আঙ্গুরির ফোন বেজে উঠল।

– হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ধমুকজ থেকে বলছি। আপনি কি আঙ্গুরি আপু?

– ওয়ালাইকুম সালাম। জ্বী, আমি আঙ্গুরি।

- আপু বায়োডাটা পছন্দ হয়নি কেন? কী সমস্যা জানতে পারি?

- আমার সাথে তার কিছুই ম্যাচ হচ্ছে না, ক্রাইটেরিয়া মিলছে না।

- আপু ক্রাইটেরিয়া মিলাতে চাইলে মিলে, না মিলাতে চাইলে মিলে না। আমি কিছু কথা বলছি মনযোগ দিয়ে শুনুন। আপনাকে এই বায়োডাটা দেয়ার আগে আরো ১৭ জনের কাছে আপনার বায়োডাটা পাঠিয়েছি। তারা রিজেক্ট করেছে কেন জানেন? তারা রিজেক্ট করেছে কারণ আপনি কাইল্লা, বাইট্রা এবং ভুটকা।

- আমি কাইল্লা, বাইট্রা আর ভুটকা? এই ফালতু কথা বলার জন্য আপনি আমাকে ফোন দিয়েছেন?

- আহা আপু! কথা শেষ করতে দিন। সবকিছু মেইলে বলা যায় না বলে ফোন দিয়েছি। আমাদের সময় কম। যা বলছিলাম... ১৮ নাম্বার জন ছিলেন রুবেল ভাই, তিনি বললেন কাইল্লা বাইট্রা ভুটকা হলেও একটা মেয়ের বিয়ে করার অধিকার আছে। এই মেয়ের বয়স ধাই ধাই করে বেড়ে যাচ্ছে, আমি রিজেক্ট করে দিলে আরেকজন রিজেক্ট করবে তারপর আরেকজন ততদিনে তার বিয়ের বয়স পার হয়ে যাবে। আমি একেই বিয়ে করতে চাই।

- কিন্তু ভাই আমি তো কাইল্লা বাইট্রা ভুটকা না। আমার রঙ শ্যামলা, আমাকে কেউ কখনও বাইট্রা বলেনি। আর বিএমআই চেক করে দেখেছি ওজন ঠিকই আছে।

- আপু আপনি নিজেকে কীভাবে দেখেন আর অন্যরা আপনাকে কীভাবে দেখে তার মাঝে বিস্তর ফারাক আছে। আপনি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন এত বয়স হওয়ার পরও কেন আপনার বিয়ে হয়নি? প্লিজ চিন্তা করে দেখুন। আপনি কাইল্লা বাইট্রা ভুটকা হবার পরও আপনার ব্যাপারে রুবেল ভাই আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আগের ১৭জনের মত রিজেক্ট করে দেয়নি। গতকাল মাত্র সিভি দিয়েছেন এর মাঝে ১৭ জন রিজেক্ট করে দিয়েছে। আপনি কি অবস্থাটা বুঝতে পারছেন? আপনি আজকের দিনটা চিন্তা করে দেখুন, আংকেল আন্টিকে রুবেল ভাইয়ের বায়োডাটা দেখান। কাল রাতে আমাদেরকে ফোন দিয়ে জানাবেন কী সিদ্ধান্ত নিলেন। আল্লাহ্ হাফেজ।

ফোন কেটে গেল, আগুরি হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। সে কাইল্লা বাইট্রা এবং ভুটকা বলে এতদিন তার বিয়ে হয়নি। আর সে কিনা ভেবেছে তার বিয়ের জন্য ঠিকমত চেষ্টা করা হয়নি, চেষ্টা করলেই বিয়েটা হয়ে যাবে।

ওদিকে...

রুবেল গতকাল রাতে ঘুমায়নি। একটু পর পর মেইল চেক করে দেখেছে ধমুকজ কোনো মেইল দিল কিনা। অবশেষে সকাল ৮ টায় মেইল এল। আঙ্গুরি নামে এক মেয়ের। বায়োডাটায় ভালো লাগার মত কিছু নেই।

ধমুকজে হাজার হাজার বায়োডাটা, একটা রিজেক্ট করে দিলে ওরা আরেকটা নিশ্চয়ই পাঠাবে। রুবেল বায়োডাটা রিজেক্ট করে দিল। কিছুক্ষণ পর ফোন এল রুবেলের নাস্বারে।

- হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ধমুকজ থেকে বলছি। আপনি কি রুবেল ভাইয়া?

- ওয়ালাইকুম আসসালাম। জ্বী বলুন।

- ভাইয়া বায়োডাটা রিজেক্ট করে দিলেন যে? কোনো সমস্যা? মেয়েকে চেনেন নাকি আগে থেকে?

- আরে না ভাই আমি চিনব কী করে। মেয়ে শ্যামলা, তার উপর ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড মিলছে না। আকাশ পাতাল তফাৎ।

- ভাই আকাশে কে আছে? আপনি না আঙ্গুরি?

- এটা কি বলে দেয়া লাগে ভাই? আমাদের এটলিস্ট ঢাকায় একটা ফ্ল্যাট আছে।

- ভাইয়া হাতে সময় কম। কিছু কথা বলব মনযোগ দিয়ে শুনবেন। কথার মাঝে বাগড়া দিবেন না। আপনাকে এই বায়োডাটা দেয়ার আগে ৩০জন মেয়ের বাবাকে আপনার বায়োডাটা পাঠিয়েছিলাম। আঙ্গুরি আপা ৩১ নাস্বার। এই ৩০ জন...

- কী বলেন ভাই! বায়োডাটা তো দিলাম কালকে! ৩০ জন কীভাবে রিজেক্ট করে?

- ভাই কথার মাঝে বাগড়া দিতে মানা করেছিলাম। আমাদের অনেক বড় প্রতিষ্ঠান। ৩০ জনের সাথে বায়োডাটা চালচালি করা কোনো ব্যাপারই না। এই ৩০ জন মেয়ের বাবারা আপনার চাকরি আর বেতন দেখেই রিজেক্ট করে দিয়েছে। আর ফ্ল্যাটের কথা বলছেন? ওটা কি আপনার ফ্ল্যাট নাকি আপনার বাবার বলুন তো? এরমধ্যে একজন গার্জেনের কথা শুনে আমি লজ্জায় পড়ে গেছি। তিনি বলেছেন আপনার নাম রুবেল, মাথায়

টাকবেল, ভুড়ি ৪০ ইঞ্চি, বেতন পান ১৫ হাজার। যে ভোটকা পেট বানিয়েছেন এই ১৫ হাজার টাকা নিজে খাবেন না বউকে খাওয়াবেন? আমি আংকেলকে কোনো জবাব দিতে পারিনি। উনি যা একটু খোলাসা করে বলেছেন। তা না হলে বাকী আংকেলরা রাখটাক করে ঐ একই কথা বলেছেন। কেবল আঙ্গুরি আপার বাবা বলেছেন ছেলের নিজের ফ্ল্যাট থাকুক না থাকুক ওটা ব্যাপার না। ছেলে ১৫ হাজার মাইনে পায় ওতেও আমার আপত্তি নেই। আপনি খোঁজ খবর নিন ছেলের মন মানসিকতা কেমন। আমার মেয়ে দরকার হলে মাসের ১৫ দিন ছেলের টাকায় খাবে ১৫ দিন আমার টাকায়। তবু একটা ভালো মানুষ চাই।

এখন ভাই আমাদের জানা দরকার আপনি ভালো মানুষ কিনা। কিছুটা মনে হয় বুঝেও ফেলেছি। ঘটকালি তো আর আজ করছি না!

– আরে বাবা আপনি কী বুঝেছেন? আমি শুধু বলতে চেয়েছি আমার বাবার ফ্ল্যাট আছে, মেয়ের বাবার ফ্ল্যাট থাকলে লেভেলটা মিলতো।

– রুবেল ভাই, এইসব মিলামিলি করে কখনও ভালো বিয়ে হয়না। আপনি বায়োডাটা এখনই আপনার বাবাকে দেখান। আমি দুই ঘন্টা পর আপনাকে ফোন দিচ্ছি। আল্লাহ্ হাফেজ।

দুই ঘন্টা হওয়ার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে আবার ফোন...

– আসসালামু আলাইকুম রুবেল ভাই, আংকেলকে বায়োডাটা দেখিয়েছেন?

– ওয়ালাইকুম সালাম। ভাই আমার বাবা সব কথা শুনে খুব ক্ষেপে গেছেন। আপনার বাবার সাথে কথা বলার দরকার নেই। এই বিয়ে হবে না।

– রুবেল ভাই, আংকেল কার উপরে ক্ষেপেছেন? আমার উপর? আমরা উপর ক্ষেপলে তার রাগ ভাঙ্গানো আমার দায়িত্ব। মুরুব্বিদের রাগ মাথায় নিয়ে ঘটকালি করতে চাই না। আংকেলকে দিন, বিয়ে না হোক তার রাগটা ভাঙ্গাই।

ধমুকজের নাম শুনে রুবেলের বাবা প্রায় কেড়ে নিলেন ফোনটা।

– হ্যালো, আপনারা নাকি বলেছেন আমার ছেলের ৪০ ইঞ্চি ভুড়ি?

– আসসালামু আলাইকুম আংকেল। ভালো আছেন?

- আগে আমার কথার জবাব দেন। আমার ছেলের ভুড়ি আছে মাথায় টাক আছে তাই ফকিন্সি মেয়ে পেলেও বিয়ে দিতে হবে?

- আংকেল, আপনি না বুঝে রাগ করছেন। আপনি আমার বাবার সমান। আমি আপনার ছেলের মতই। আপনি করে ডাকবেন না আমাকে। কিছু কথা বলার ছিল, আপনি যদি শুনতেন।

- ধানাই পানাই না করে আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

- আংকেল, ভুড়ি, টাক এগুলো ছেলেদের অহংকার। এগুলোর জন্য কেন ফকিন্সি মেয়ে বিয়ে করাবেন? মিনিমাম একটা স্ট্যান্ডার্ড তো মেনটেন করতেই হবে।

- ঢাকা শহরে বাড়ি নাই, ফ্ল্যাট নাই, কালো খাটো মেয়ে আমার ছেলের জন্য স্ট্যান্ডার্ড?

- আংকেল আপনার সাথে দ্বিমত করব না। কিন্তু বিষয়টা আপনি যেভাবে দেখছেন তার থেকেও জটিল। আপনার সারাজীবনের সঞ্চয়ে ঢাকায় একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন। সেই ফ্ল্যাটে ছেলে মেয়ে সবাইকে নিয়ে আছেন। এটা পাত্রের কোনো যোগ্যতা না। পাত্রের যোগ্যতা হল সে মাসে ১৫ হাজার টাকা ইনকাম করে। ভবিষ্যতে বেতন বাড়বে কিনা তার কোনো ঠিক নেই। এখন যদি বাড়ি গাড়িওয়ালা রাজকন্যা বিয়ে করান, প্রতি পদে পদে তার হুকুমে আপনাদের চলতে হবে। আজ নিজের ফ্ল্যাটে ছেলেমেয়ে সবাইকে নিয়ে আছেন। কাল শুধু রাজকন্যা আর আপনার ছেলে থাকবে ফ্ল্যাটো আর আপনারা সপরিবারে গাছতলায়। ফকিন্সি মেয়েকে মানানো সহজ, রাজকন্যাকে মানাতে পারবেন?

- তাই বলে এমন মেয়ে? চেহারা সুন্দর হলেও তো বুঝতাম।

- চেহারা দিয়ে কী হবে আংকেল? এখন বুঝতে পারছেন না। সুন্দরী রাজকন্যা গাছতলায় পাঠিয়ে দিলে হয়ত বুঝবেন। ঘটকালি অনেকদিন যাবত করছি। তাই সব ঘটনার শেষটা আগেই দেখতে পাই। আপনাকে এখনই কোনো সিদ্ধান্তে আসতে হবে না। আজকের দিনটা চিন্তা করে দেখুন। রুবেল ভাইয়ার বয়স কম। আবেগ দিয়ে সব চিন্তা করে। তাই আপনার সাথেই কথা বললাম। ভালো থাকবেন আংকেল, আল্লাহ্ হাফেজ।

★তৃতীয় দিন★

আঙ্গুরি গতকাল রাতে তার বাবা মা কে বায়োডাটা দেখিয়েছে। মায়ের মন, ঠিকই বুঝেছেন মেয়ের কিছু হয়েছে। একটু মাথায় হাত রাখতেই হাউমাউ করে মেয়ের কান্না...মা আমি কাইল্লা বাইটা ভুটকা বলে ১৭ টা ছেলে আমাকে রিজেক্ট করে দিয়েছে।

আঙ্গুরির বাবা বায়োডাটা পড়বেন কী, মা মেয়ের কান্নার মহোৎসব দেখছেন। মেয়ে কাঁদে, মা-ও কাঁদে। মা বলছে “কে বলেছে তুই কালো? ওদের চোখের সমস্যা। আন্ধা ছেলের সাথে বিয়ে দিব নাকি! তুই আমার কাছেই থাকবি। তোকে বিয়ে দিব না আমি।”

ওদিকে মেয়ের কান্না এখনই পাড়ার আন্টিরা জিজ্ঞেস করে বিয়ে করি না কেন। বিয়ে না করলে সারাজীবন কথা শুনতে হবে।

আঙ্গুরির বাবা দুজনকে ধমকে থামালেন। মেয়ের থেকে ধমুকজের ফোন নাম্বার নিয়ে রাখলেন ফোন দিবেন বলে।

তৃতীয়দিন সকাল বেলা আঙ্গুরির বাবা ধমুকজের নাম্বারে ফোন দিলেন। এক চাপুন দুই চাপুন ইত্যাদি ঝামেলায় টাকা গেল প্রচুর কিন্তু কথা হল না।

ওদিকে রুবলের বাবা সারারাত চিন্তা করে সিদ্ধান্তে আসলেন আঙ্গুরির সাথেই ছেলের বিয়ে দিবেন। ১৫ হাজার মাইনের ছেলে নিয়ে অত নকশা চলে না। নিজেরও সম্বল বলতে ঐ একটা ফ্ল্যাট। কোন মুখে মেয়ের বাড়ির প্রাচুর্য দেখবেন? প্রাচুর্যের চেয়ে শান্তি বড়।

সকালে ধমুকজ থেকে ফোন এল। তিনি জানিয়ে দিলেন তিনি রাজি, ছেলেকে ম্যানেজ করা দুই মিনিটের ব্যাপার। ছেলের মা ঝামেলা করতে পারে, তাতে কী যায় আসে।

ছেলের দিকে সব ম্যানেজ হওয়ার পর ধমুকজ থেকে ফোন গেল আঙ্গুরির কাছে। ধমুকজ প্রতিনিধি আঙ্গুরির বাবার সাথে কথা বলতে চান।

– আসসালামু আলাইকুম আংকেল। ভালো আছেন?

– ওয়ালাইকুম সালাম বাবা। ভালো আছি। তোমাকে তো ফোন দিয়েছিলাম। লাইনে পেলাম না। তুমি করে ডাকলাম কিছু মনে করো না।

– না আংকেল কী যে বলেন। আপনি আমার বাবার মত। বায়োডাটা কী পছন্দ হয়েছে আংকেল?

- অত পছন্দ অপছন্দের উপায় আছে বাবা! যা শুনলাম! ১৭ জন রিজেক্টই করেছে কেবল মেয়েটা কাইল্লা বাইট্রা আর ভুটকা বলে। এরপর আর পছন্দ অপছন্দ কী! বিয়ে দেয়াটা দরকার হয়ে পড়েছে। বয়স বেড়ে যাচ্ছে মেয়ের।

- আংকেল এইজন্যই! এইজন্যই আমি মেয়ের বাবাদের রেসপেক্ট করি। যতগুলো ফ্যামিলি ডিল করেছে তার মধ্যে মেয়ের বাবাদেরকেই বিচক্ষণ পেয়েছি। তাহলে আংকেল আপনি রাজি?

- হ্যাঁ বাবা আমি রাজি। আমার মেয়ে একটু কষ্ট পেয়েছে। কিন্তু ওকে তো বাস্তবতা বুঝতে হবে।

- সেটাই আংকেল। আপনার মেয়েকে তো আমি তেমন কিছুই বলিনি কষ্ট পাবে বলে। আপনাকে বলি...এক ছেলে আপনার মেয়ের বায়োডাটা দেখেই বলেছে এটা কোন জাতের আঙ্গুর? কালো কালো গামা সাইজের গুলা? চিন্তা করেন অবস্থাটা!

- ওসব কথা থাক। তুমি ডেইট ঠিক করার ব্যবস্থা কর। ঠিক আছে আংকেল। কালকেই দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে ফেলব। হাতে সময় কম। রাখি তাহলে আল্লাহ্ হাফেজ।

★চতুর্থ দিন★

আঙ্গুরি আর রুবেলের পরিবারের দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা হল। সবার সবাইকে পছন্দ হয়েছে। আঙ্গুরির মা বারবার বলছেন একেবারে সোনায়ে সোহাগা। রুবেলের মা চুপচাপ আছেন। তবে দুই পক্ষের বাবারাই বেশ খুশি।

ধমুকজ প্রতিনিধি নিজ উদ্যোগে বিয়ের তারিখ ঠিক করলেন। ঠিক হল আগামীকালই বিয়ে পড়িয়ে নেয়া হবে। বিয়ে যত দেরি হবে তত সমস্যা। আত্মীয়স্বজন এসে নিত্যানতুন গেঞ্জাম বাঁধানোর আগেই বিয়েটা পড়িয়ে ফেলা জরুরী। কাল সকালে প্রতিনিধি নিজে উপস্থিত থেকে আরেকটি বিয়ে দিবেন। তাই এই বিয়ে পড়ানো হবে দুপুরে।

★পঞ্চম দিন★

একদিনের মাথায় খুব বেশি ধুমধাম হইচই করা গেল না। হইচই যা হল সবই আঙ্গুরির বাবা করলেন। আঙ্গুরি সাজবে কখন, এখনও পার্লারে যাচ্ছে না কেন? বাবুর্চি মুরগির গিলা কলিজা কই সরালো এসব নিয়ে তিনি সকাল থেকে হইচই করে গেলেন পাত্র

পক্ষ আসার আগ পর্যন্ত। ধমুকজ প্রতিনিধি খেয়াল রাখলেন যাতে শেষ মুহূর্তে কোনো ক্যাচাল না হয়। কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই বিয়ে পড়ানো হয়ে গেল। এখন থেকে আগুরি রুবলের স্ত্রী।

মেয়ের বাবার মাথা থেকে যেন বোঝা নামল। মেয়েকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে ধমুকজ প্রতিনিধি বিদায় নিবেন এমন সময় মেয়ের বাবা তাকে হাত ধরে বসালেন।

- বাবা, এই বিয়ের ঝামেলায় তোমাকে একটা ব্যাপার জিজ্ঞেস করতে পারিনি। তোমাদের এই ধমুকজের মানে কী?

- আংকেল ধমুকজ মানে “ধর মুরগী কর জবাই”। এটা আমরা কাউকে বলি না। আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে তাই বললাম।

- কী! এখানে মুরগী কে?

- আহহা! মুরগী চিনেন না আংকেল? মুরগী হল যেটার রোস্ট আমরা খেলাম আজকে।

- কিন্তু এর সাথে ঘটকালির সম্পর্ক কী?

- এই সম্পর্কটাও বলা নিষেধ। তবু আপনাকে বলি... ঘটকালি মানেই বিয়ে। বিয়ে মানেই মুরগীর জবাই। কারণ বিয়েতে মুরগীর রোস্ট থাকতে হবে। জবাই না করে রোস্ট খাওয়া যায়, বলেন আংকেল?

- আরেহ তাই তো! এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝলাম না! মেয়ে বিয়ে দিয়ে একলাফে বুড়ো হয়ে গেলাম নাকি! হাহাহা!

আগুরির বাবা দুলে দুলে হাসছেন। ঘটকও হাসিতে তাল দিয়ে উঠে পড়লেন। সন্ধ্যায় আরেকটা বিয়ে পড়াতে যেতে হবে।

শিক্ষণীয় : কোনো অসম্ভব কাজকে সম্ভব করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল ঐ কাজ সংশ্লিষ্ট সবার মনে কমপ্লেক্স তৈরি করে দেয়া। তাই যখন কারো সম্মুখীন হবেন যিনি অকারণে কমপ্লেক্স তৈরি করায় পারদর্শী তখন সালাম দিয়ে দূরে সরে যাওয়াই সমীচীন।

হিজাব কি আমার চয়েস? উম্ম মারঈয়াম

১.

তখন মাত্র উপলব্ধি করতে পেরেছি হিজাব করতেই হবে। মাথায় ওড়না কোনমতে দিয়ে না, চুল ঢেকে। শুরু করলাম ওড়না আর পিন দিয়ে হিজাব করা। আমার মনে আছে ল্যাভে কাজ করতে করতে হঠাৎ দম আটকে আসতো।

এক দৌড়ে কমনরুমে গিয়ে ওড়না এদিক ওদিক ঘুরিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হিজাব করার চেষ্টা করতাম, যাতে ওড়না গলায় না লাগে, আবার চুলও ঢাকা থাকে।

তিনঘন্টার ল্যাভে ওড়না ঘুরতে ঘুরতে কোথা থেকে কোথায় যেত, মনে হত দম আটকে আসছে। তবু পিন খুলে ফেলতাম না, কারণ আমি জেনেছি হিজাব করতেই হবে।

এটা আমার চয়েস হলে এত কষ্টের দরকার ছিল না। চয়েস পালটে নিতাম।

২.

একসময় জানলাম আমার হিজাব ঠিকমত হচ্ছে না। সিদ্ধান্ত নিলাম বোরকা পড়বো। বোরকা পড়ার আগে খুব সম্ভবত আমার জীবনের সবচেয়ে কম বাজেট ছিল জামা কাপড়ে। ঈদে জামা গিফট পাই। ভার্টিসিটিতে অনেক জবরজং জামা পরার চল তখন তেমন একটা ছিল না। মাঝে মাঝে দুই একটা ড্রেস নিজেও বানাতাম, কিন্তু খরচ মিনিমাম রাখতাম। এক হাজারের উপরে একটা জামার পেছনে খরচ করলে আমার পক্ষে সে জামা পরা সম্ভব হত কি না সন্দেহ।

আমি খুব সিম্পল হ্যান ত্যান এমন কিছু বোঝাতে চাচ্ছি না। বিষয় হচ্ছে এই জামা কাপড়ের বিষয়ে আমার ঔদাসীন্য কাজ করত, এর পেছনে এত খরচের যৌক্তিকতা খুঁজে পেতাম না। এখনও তাই।

সেই আমি যখন বোরকা পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম, জানতে পারলাম এক হাজারের মধ্যে কোনো বোরকা নেই। বোরকার স্পন্সর আমার বোনই করতো। কিন্তু আমার প্রথম প্রথম ভীষণ অস্বস্তি লাগত পর্দা করতে এত টাকা খরচ?

এখনও বলতে দ্বিধা নেই যে আমার চয়েস নিউমার্কেটের ফুটপাথের কুর্তি। কিন্তু বোরকা পড়তেই হবে তাই পড়ি। পোশাকের পেছনে এত খরচ আমার চয়েস না। চয়েস হলে পালটে নিতাম।

৩.

যখন নিকাব ধরি, মনে হত নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। একটু পরই মরে যাব। নিজেকে বোঝাতাম এমন একটা সময় আসবে, যখন আমি নিকাব ছাড়া বাইরে যাওয়া কল্পনাই করতে পারব না। ঐ সময় আসার আগ পর্যন্ত নিকাব পড়তে নিজের সাথে রীতিমত যুদ্ধ করেছি। কারণ, নিকাবকে আমার চয়েস হিসেবে নেই নি, ফরয হিসেবে নিয়েছি (ইখতিলাফ আছে জানি, সেটা ভিন্ন আলোচনা)।

৪.

একটা সময় ছিল যখন পিচ্চি কাজিন আমার কোলে কোলে ঘুরেছে। ওর সাথে খেলেছি, ওর হাতে নিয়মিত মার খেয়েছি (যেকোনো পিচ্চির মারামারির সহজ টার্গেট ছিলাম আমি)।

পর্দা শুরু করার পর, একদম হাতের সামনে চোখের সামনে বড় হওয়া কাজিন যখন বাসায় আসে তখন একবার বোরকা চাপিয়ে সালাম দিয়ে নিজের রুমে চলে আসি। খুব কষ্ট লাগে, হাহাকার লাগে এই পিচ্চিই না আমাদের সাথে হেসে খেলে বড় হল? এখন ওর সামনে পর্দা করা লাগে। হিজাবকে আমি চয়েস কীভাবে বলি? যদি চয়েস হত, চয়েস পালটে নিতাম না?

একটা প্রবাদ আছে, ইনফেরিয়রিটি কম্পেক্স ইজ দ্য ফাদার অব সুপেরিয়রিটি কম্পলেক্স। আমি সবসময় বলি মানুষ হিজাব নিয়ে আক্রমণ করে হীনম্মন্যতা থেকে। আমরা যখন জবাব দিতে যাব, তখন খেয়াল রাখতে হবে আমরাও যেন সেই একই হীনম্মন্যতায় ভুগে নিজেকে সুপেরিয়র প্রমাণের চেষ্টা না করি।

সচেতনভাবে হোক আর অবচেতনভাবেই হোক, হিজাব আমার চয়েস এটাতে একধরনের সুপেরিয়রিটি প্রকাশ পায়।

তাছাড়া আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যেমন খুশি ড্রেস আপ করা ইসলাম বিদ্বেষীদের চয়েস। কিন্তু ওরা বোরকা পড়তে ইচ্ছা করলেও পড়বে না। পড়লে ইসলাম বিদ্বেষী তকমাটা আর থাকে না। এই এংগেলে চিন্তা করলে ওদের স্বাধীনতা নেই, ইসলাম বিদ্বেষের কাছে ওরা বাঁধা পড়ে গেছে। মনমতো বোরকাটাও পড়তে পারে না।

যে অসীম স্বাধীনতার কথা বলে, সেটার অস্তিত্ব নেই বাস্তবে। তাই ওদের সাথে
চয়েসের তর্কে যাওয়া অর্থহীন।

যেমন খুশি ড্রেস আপ করা ওদের চয়েস না, বোরকা পড়াও আমাদের চয়েস না।
যদি চয়েস হত, কবেই পালটে নিতাম!

ভালোবাসার মাপকাঠি

উন্মে লিলি

১.

মাসজিদ থেকে বের হয়ে বাসার পাশের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকলো শফিক। এক প্যাকেট জেমস চকলেট নিল সীমার জন্যে। অভিমান ভাঙ্গানোর দাম ১০ টাকা। আল্লাহ কাছে মনে মনে শুকরিয়া আদায় করলো, অল্পে সন্তুষ্ট হওয়া বউ পেয়েছে বলে।

মাসজিদে যাওয়ার আগে হঠাৎই রাগ করে ফেলেছিল সীমার সাথে। চোখে পানি চলে আসলেও সীমা আর আগের মতো রিএক্ট করেনি, মুয়াযের সাথে খেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সীমার মন খারাপ কখনো চোখ এড়ায় না শফিকের।

হঠাৎ রেগে যাওয়াটা শফিকের অনেক পুরানো বদভ্যাস। তখন শফিক এতো কঠিন কথা বলতে পারে, যা ঠান্ডা মাথায় সে ভাবতেও পারে না। শফিকের কঠিন কথায় সীমার সারাক্ষণ ঝরনার মতো কল কল হাসি মুহূর্তে ম্লান হয়ে যায়। পকেট থেকে কাঁচের স্কেলটা বের করে শফিক। লাভ স্কেলটার ভ্যালু এখন আর জিরো দেখাচ্ছে না। সীমার সাথে তখন কথা না বললেই হতো। তাহলে সীমা আর বুঝতে পারতো না লাভ লেভেল কতটা নিচে নেমে গেছে।

সালাহ শেষে শফিক অনেকদিন চেক করে দেখেছে ভ্যালু ইনক্রিজ করে। এই বিষয়টা প্রথম সীমাই ওকে দেখিয়েছিল। আল্লাহ দিকে ধাবিত হলে ভালোবাসার অনুভূতির তরঙ্গ কেমন বেড়ে যায়। সেই তরঙ্গ স্কেলের তরঙ্গের সাথে অনুরণ করে মান বৃদ্ধি করে দেয়।

সারাদিন তো আখিরাত নিয়ে পড়ে থাকা সম্ভব না। তাই ভালোবাসায় টইটম্বুর স্কেল কমই দেখা যায়। ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধি হয় আর ভালোবাসাও কমে বাড়ে। শফিক চেষ্টা করে যেখানে যতটুকু ভালোবাসা দেখানো উচিত তার বেশি না দেখাতে। ভালোবাসার মান জিরো হয়ে গেলে তখন চাইলেও রাগ, ঘৃণা লুকানো সম্ভব না।

সীমার অবশ্য সাংসারিক বুদ্ধি একেবারেই কম ছিল। সারাদিন অপাত্রে ভালোবাসা টেলে যখন তখন বিষন্নতায় ভুগত। কিছু বলতে না বলতেই কেঁদে দিত। শফিক সীমাকে বুঝিয়েছে অনেক। সাইকিয়াট্রিস্টকেও দেখিয়েছে। ওষুধ লাগেনি, তিনি আচ্ছা মতো কাউন্সেলিং করে দিয়েছেন সীমাকে। সীমা এখন অনেকটাই ম্যানেজ করতে শিখে

গেছে। শফিক যখন বলে , ‘ডঃ সুফিয়ার কাছে নেয়াটা কেমন ওয়াইজ হয়েছিল বলোতো ’সীমার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠে।

২.

দেড় বছরের ছোট মুয়াযের সামনে কাঁদা যায় না। মুয়ায বলে ওঠে“ ,মা, ব্যথা? কষ্ট মা?” দেড় বছরেই পটপট করে কথা বলা শিখে গেছে মুয়ায। ওর সামনে কিছু বলাও বিপদ , করাও বিপদ। তবে চোখের পানি এখন অনেকটাই সামলে নিতে পারে সীমা। সকল প্রশংসা শুধুই আল্লাহর। সেদিন রামীসার পরামর্শ এতটাই কাজে লাগবে ভাবতেও পারেনি সীমা।

রামীসা ওর ভার্টিটির বন্ধু। সীমা সবসময়ই লাভস্কেলের বিড়ম্বনায় পর্যুদস্ত ছিল। মেপে মেপে ভালোবাসা ওর খাতে সয় না। সবাই ওকে ছোটবেলা থেকে পাগলি হিসেবেই চিনে।

মা ওকে বারবার বলত ‘সীমা! স্কেলের দিকে কিন্তু নজর রেখো মা।’ সীমা শুনেও শুনত না। কাউকে একগাদা ভালোবাসা দিয়ে কখনো হাপুস নয়নে কাঁদত, কখনো ঝগড়া লাগাতো, কখনো বা মনমরা হয়ে বসে থাকতো। মা কাঠের স্কেলটা বের করে দেখতেন ভালোবাসার কেমন নাজেহাল দশা হল।

বিয়ের আগে তেমন একটা সমস্যা হয়নি। সীমাকে সবাই এভাবেই চিনতো। আর রক্তের প্রতি মানুষের লাভস্কেলে একটু বেশি ভালোবাসা থাকেই, যতই মান অভিমান হোক না কেন! সীমা ভেবেছিল তার মাপহীন ভালোবাসা দিয়ে শশুড়বাড়িতেও জীবনটা কাঁটিয়ে দিবে। শশুড়বাড়ীর সবাই উদার মনের। কিন্তু সারাক্ষণ কেউ পকেট থেকে, কেউ ব্যাগ থেকে, কেউ দেয়ালে ঝুলন্ত লাভস্কেল চেক করতে থাকেন। হঠাৎ গল্পের মাঝে কাজের ছুঁতায় উঠে স্কেল চেক করেন। কেউ সীমার হাসির দিকে বিরক্ত হয়ে তাকান, সরে যান প্রগলভ এই মেয়েটার সামনে থেকে।

প্রচন্ড মাপা ভালোবাসার এই বলয়ে সীমা বেমানান। বিয়ের পর মা-ও যেন সীমার পর হয়ে গেছেন। কখনো ভুল বুঝেন, কখনো ভালোবাসেন। সীমাও সবাইকে ভুল বুঝে অল্পে কেঁদে কেটে একাকার। রামীসা অফিস নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও সীমার করুণ অবস্থা বুঝেছিল। এক ছুটির দিনে কার্জন হলে সীমাকে ডাকল। তবে অবশ্যই লাভ স্কেল সাথে আনতে বলল। সীমা একটু অবাক হলেও ব্যাগে লাভ স্কেল নিল। শাশুড়িমার কাছে মুয়াযকে রেখে সীমা বের হলো। শাশুড়ি মা লাভস্কেল চেক করে বললেন দেড় দুই ঘন্টার বেশি দেরি না করতে।

মুয়ায এতো ভালোবাসা কেড়ে নেয় যে বেশিক্ষণ ওর সাথে থাকা কঠিন। মন খারাপ লুকিয়ে সীমা বের হয়ে পড়ে। মাপা মাপা আবেগের বলয় থেকে বের হয়ে নিঃশাস নিল সে।

রামীসাকে পুরো ভাসিটি লাইফে কোনদিন লাভস্কেল বের করতে দেখেনি সীমা। আজ সেই সীমাকে স্কেল আনতে বলেছে। সীমার রিকশা কার্জনে এসে থামল। গেইট দিয়ে ঢুকতেই সীমার মন আনন্দে ভরে উঠল। জোরে নিঃশাস নিল সীমা। এখন লাভস্কেল বের করলে না জানি কতো ভালোবাসা দেখবে। কার্জনের সবুজ ঘাস ওর চোখে প্রশান্তি দেয়। পুরানো ইট-কাঠের বিল্ডিংগুলো অন্যরকম মায়া তৈরি করে।

ছেলেদের হলে ঢোকা একদমই পছন্দ না হলেও সীমার জোরাজুরিতে রামীসা শহীদুল্লাহ্ হলের পুকুর পাড়ে এসে বসে। ফটোকপির দোকানগুলো এখানে হওয়ায় না চাইতেও মেয়েদের এদিকে আসতেই হয়। সিড়িতে বসে নিস্তরঙ্গ পুকুরের দিকে চুপচাপ দুজন তাকিয়ে থাকল।

নিরবতা ভাংল রামীসা“ ,তোর কি সবসময় মনে হয় তোকে সবাই কষ্ট দিচ্ছে কিন্তু সেটা তারা বুঝতে পারছে না। দোষ হচ্ছে তোর আবেগের”?

সীমা বলল“ ,হুম মনে হয়।”

- “শোন সীমা! কষ্ট আমরা সবাই সবাইকে দেই। বুঝে, না বুঝে। কেউ অনুতপ্ত হই, কেউ হই না। কেউ অনুতপ্ত হয়েও মাপ চাইতে পারি, আর কেউ পারি না ইগোর ঠ্যালায়। এই হলো পার্থক্য।”

- “আমি আবেগকে কন্ট্রোল করতে চাই।”

- “আবেগ নিয়ন্ত্রণে আনা জরুরী, কিন্তু আবেগহীন হওয়ার কোনো মানেই হয় না। তুই কখনো খেয়াল করে দেখেছিস রামাদানে ভালোবাসা স্কেলটা খুব কমই নীল হয়।”

- “হ্যাঁ। রামাদানে, সালাহ, যিকর, তারাবীহ নিয়ে এতো ব্যস্ত থাকি; পাপ পূণ্যের চিন্তাও বেশি আসে তাই দুনিয়ার অনেক কিছুই চিন্তায় আসে না।”

- “এক্সট্রালি সীমা। তুই দুনিয়া নিয়ে যত কম চিন্তা করবি তোরা লাভ লেভেল বাড়বে। এই দুনিয়ার বেশিরভাগ বিষয়ই দূষিত। খেয়াল করে দেখিস যেদিন গীবত বেশি হয় সেদিন লাভ স্কেলের কেমন করুণ দশা থাকে।”

- সীমা ড্র কুঁচকে জিঞ্জের করল, “তুই বলতে চাচ্ছিস যে যত ঘ্রীনের দিকে ঝুঁকবে তার ভেতরে ভালোবাসা তত বেশি থাকবে? তাহলে নাস্তিকরা এতো ভালোবাসা দেখায় কিভাবে?”

- রামীসা বলল, “জানিসই তো ওদের দড়ি টিল করে রাখা হয়েছে। এই দুনিয়ায় ওরা মৌজ মাস্তি করে নিকা আমাদের পরীক্ষা তো একটু বেশিই হবে। আর আল্লাহর দয়া তো দুই প্রকার। এই দুনিয়ায় আমাদের প্রতি যেমন আল্লাহ্ রহম করেন, ওদের প্রতিও করেন। কিয়ামতের দিন ওরা আর দয়া পাবে না।”

- “তাহলে আবেগ কন্ট্রোল করতে আমাকে কী কী করতে হবে। আমি মেপে মেপে ভালবাসতে পারবো না।”

- “তুই তো ফরযগুলো আদায়ের চেষ্টা করিস। হারাম থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। গীবত থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। যত পারিস যিকর কর। আল্লাহ যিক্রে অন্তর ঠান্ডা হয় রে। তাহাজ্জুদে আল্লাহ কাছে কাঁদ। কুরআন পড়। কেউ কষ্ট দিলে পাল্টা কষ্ট না দিয়ে, তার সামনে বেসামাল আবেগ না দেখিয়ে যিক্র কর। যাদের কথায় কষ্ট পাচ্ছিস তাদের ভালো দিকগুলোর কথা চিন্তা করে সম্মান কর। খারাপ কথা মাথায় আসলে সাহাবীদের জীবনী পড়। মনের মধ্যে একটা জগত তৈরী কর। কিছু হলেই সালফে সালেহীদের জীবনে ঢুকে পড়ে তাদের কষ্টের সাথে নিজেরটা মিলিয়ে নিস। তাদের ঈমানের শক্তি থেকে শক্তি নিস। তোর কষ্টগুলো কখনো তুচ্ছ নয়। কিন্তু এই কষ্টে ডুব দিয়ে জীবনটা ম্যারম্যারা করে ফেলিস না।”

- “চেষ্টা করব এখন থেকে, স্কেলটা কেন আনতে বলেছিস? তোকে তো একদিনও দেখলাম না স্কেল ইউজ করতে?”

- “স্কেলটা এই পুকুরের পানিতে ফেলে দে। যে আল্লাহ্কে সুখের দিনে মনে রাখে, আল্লাহ তাকে দুঃখের সময় দেখবেন। তোর স্কেল লাগবে না। কষ্টের পর স্বস্তি আসবে। তুই আল্লাহ্কে মনে রাখবি আল্লাহ্ তোর মনকে ভালোবাসায় ভরে দিবেন। প্রথম প্রথম কষ্ট হবে। কোনো কোনো দিন এদিক সেদিক হয়ে যাবে। কিন্তু আস্তে আস্তে কন্সিস্ট্যান্সি বাড়বে। মেপে মেপে ভালোবাসা আমাদেরকে মানায় না।”

সীমা স্কেলটা ছুড়ে ফেলল। রামীসা বলল না যে অনার্স সেকন্ড ইয়ারে সে-ও লাভ স্কেল ছুড়ে ফেলেছিল। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে সীমাকে বেশিরভাগ সময়ই যিকর করতে হয়। রান্নার সময় বিড়বিড় করে। শফিক হঠাৎ রেগে গেলেও। মা এর সাথে ভুল বোঝাবোঝিটাও এখন কমে গেছে।

“জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়।” [১৩:২৭]

পরিত্যক্ত ডায়েরি নুসরাত জাহান মুন

“সুইসাইড করতে ইচ্ছে করে সারাক্ষণ। কোনো কিছুই ভালো লাগে না। জীবনটা অর্থহীন মনে হয়। বাঁচার কোনো ইচ্ছে নেই আমার। কেনো বাঁচবো! কার জন্য বাঁচবো! যাকেই আমি ভালোবাসি, সেই তো ধোঁকা দেয়।

তপুকে নিজের জীবনের থেকেও বেশি ভালোবেসেছিলাম। কতো কি করেছি ওর জন্য।

আব্দু আনুর চোখে পানিও এনেছি ওর জন্য। তপুও আমাকে ধোঁকা দিলো। আমার এতো কষ্ট! আল্লাহ্ কি কিছুই দেখে নাহ! কতো মানুষ মারা যায় ডেইলি। আমি মরি নাহ!

অনেকবার সুইসাইড করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেটাও পারিনি। কোনো না কোনো ভাবে বেঁচে গেছি। ওরনা দিয়ে ফ্যানের সাথে ঝুলেছিলাম। কিন্তু ওরনা ঠিক করে বাধা হয়নি। তাই ধপাস করে পরে, কোমরে ও বাম পায়ে ব্যথা পেয়েছি। আর সাথে গলায় তো ফাঁসির দাগ আছেই। একসাথে ৫ পাতা হিস্টারি খেয়েছিলাম।

তারপর, টানা ১৫ ঘন্টা ঘুমিয়ে আমি আবার সজাগ। এমনতেই আমি ডেইলি ১০/১২ ঘন্টা ঘুমাই। তাই টানা ১৫ ঘন্টা ঘুমানোটা বাসার কারো কাছেই অস্বাভাবিক কিছু লাগেনি। নাহয় কেউ হয়তো খেয়ালই করে নাই। কেউই আমাকে ভালোবাসে নাহ!”

এইটুকু লিখেই চোখ ঝাপসা হয়ে এলো ইত্তিহার। দুনিয়া জোড়া কান্না পাচ্ছে ওর।

নীল মলাটের ডায়েরিটা টেবিল থেকে সরিয়ে অনেক্ষন বাচ্চাদের মত কাঁদলো। তারপর, নীরবে ফ্যানের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকলো, ঠিক কিভাবে ওড়না বাধলে আর খুলে

যাবে না। ইদানীং, কিছুই ভালো লাগে না ইত্তিহার। এ ব্যাপারটা একবার দীপ্তিকে বলেছিলো। দীপ্তি বলেছিলো সাইকোলজিস্ট দেখাতে। “মাথা খারাপ, নাকি!” ওতো আর পাগল হয়ে যায়নি। সাইকোলজিস্ট কেনো! ইশ্! তপুর সাথে যদি একটু কথা বলা যেতো! হয়ত একটু ভালো লাগতো। কাঁদতে কাঁদতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লো ইত্তিহা।



ঘুম ভাঙ্গলো মায়ের ডাকে – “কিরে! এই বেলায় কি ঘুমাচ্ছিস তুই! শরীর খারাপ করেছে, নাকি?” “নাহ্! তুমি এখান থেকে যাও। বলেছিনা অযথা আমার রুমে আসবে না।” এই বলে, উঠে বসলো ইত্তিহা। মায়ের সাথে এমন ব্যবহার করে ওর খারাপ লাগাটা আরো বেড়েছে। আবার ডায়রি লেখা শুরু করলো। কে যেন ওকে বলেছিলো, মনের কথা ডায়রিতে লিখলে নাকি মন ভালো হয় যায়। সব ফালতু কথা! কোনো কিছুতেই এখন আর ওর মন ভালো হয় না। তবুও লেখা শুরু করলো।

“মায়েরা নাকি সবার মনের কথা বুঝে। আমার মা কেনো বুঝে না তাহলে! আমি তো আর টিনএজার না, যে সারাক্ষণ আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে! সব কিছু একেবারে হাতে ধরে শিখাতে হবে! মা সারাদিন আমাকে বকে। মাও আমাকে ভালোবাসে না।”

আবার যেন ঝড়ের মত কান্না পাচ্ছে ইত্তিহার। কিন্তু সে নিজেই বুঝতে পারছেনো ঠিক কি কারণে ওর কান্না পাচ্ছে। মা ঘুম থেকে তুলে দিলো, এই জন্য! তপু ফোন ধরছে না, এই জন্য! নাকি কেউ ওকে ভালোবাসে না, এই জন্য! নিজেকে এখন সত্যিই পাগল মনে হচ্ছে ইত্তিহার। কিছু ভেবে পাচ্ছে না। পুরো মাথা ব্লাঙ্ক হয়ে আছে। অথচ সামনে মিড। পড়াশোনার গোপ্লাছাট অবস্থা। ভাবলো একটু ফেসবুকে মেসেজ চেক করে দেখবে, তপু মেসেজ দিলো কিনা। নাহ্! দেয় নি। দিবেও না হয়ত আর!

নিউজ ফিড ঘেটে কিছু গল্প পড়লো সে। সবই ভালোবাসার গল্প। আল্লাহ্ সবার জীবনেই ভালোবাসা দিয়েছে। শুধু তার তপুকেই কেড়ে নিলো। এসব ভাবতে ভাবতে স্ক্রোল ডাউন করছে। হঠাৎ একটা বাক্যে চোখ আটকে গেলো। লেখা, ” আত্মহত্যা করবেন ভাবছেন!” কৌতূহল নিয়ে পড়া শুরু করলো। দু এক লাইন পড়েই মেজাজ খারাপ করে ফোনটা খাটের উপর ছুড়ে ফেললো। রাগে গা জ্বলছে ইত্তিহার। কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে সে আবার ডায়রি লেখা শুরু করলো।

“তাহমিনা আপুর একটা পোস্ট দেখে ভাবলাম পড়ে ভালো লাগবে। দুই লাইন পড়েই দেখি, সেই কোরআন হাদীসের প্যাঁচাল। এই সব হুজুর টাইপ মানুষরা কি আর কিছু পায় না, নাকি! ফেসবুকেও কি কোরআন হাদীস ঢুকানো দরকার আছে। কাজিন, তাই আনফ্রেন্ডও করতে পারি না। মেসেজ নোটিফিকেশন অফ করে রাখসি। তা না হলে, দুদিন পরেই নতুন নতুন বইয়ের লিংক দিবে। নাহয় বলতে থাকে, ‘এই বই ভালো তুই পড়িস। পড়সিস তো।’ সবই কোরআন, হাদীস, ইসলাম রিলেটেড। কতবার বলসি এইসব পড়তে আমার ভালো লাগে না। তাও দিতেই থাকে। একবার তো বিরক্ত হয়ে ব্লক করেই দিয়েছিলাম। ভেবছিলাম বুঝবে। নাহ! পরে আম্মুর সামনে আমাকে জিজ্ঞেস করে, ‘কিরে ইত্তিহা, তুই কি ব্লক করলি আমাকে!’ আর কি করা! আবার আনব্লক করে ফ্রেন্ড হওয়া লেগেছে। ভেবেছিলাম, এইবার অন্তত শিক্ষা হবে। কিন্তু নাহ! উনি এখন আরো নতুন উদ্যমে, খুশি মনে ফেসবুকে ইসলাম রিলেটেড পোস্টও দেয়া শুরু করেছেন। কোনো লজ্জাও নেই মনে হয়! এভয়েড করতেসি, দেখতেসে বুঝতেসে তাও গায়ে পরে কথা বলতে আসে!

একটা সময় আমি আর তাহমিনা আপু বেস্ট ফ্রেন্ডের মত ছিলাম। একই ড্রেস পরতাম। জুতা, চুলের ক্লিপ থেকে শুরু করে সব একই কিনতাম। এমনকি একই

ছেলেকে দেখে আমরা দুজন একই সাথে ক্রাশ খেতাম। একই সাথে একই গান শুনতাম। তখন তাহমিনা আপুরা আমাদের পাশের বাসায় থাকতো। হঠাৎ, ফুফার পোস্টিং রাজশাহী হলো। ওরা চলে গেলো। প্রায় এক বছর আমাদের দেখা হয়নি। কিন্তু ফেসবুকে ডেইলি চ্যাট হত। তখন থেকেই ও আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে যায়। কথায় আছে, সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে। ওর বেলায়ও একই অবস্থা হয়।

এক বছর পর যখন আমাদের দেখা হয়, তখন তো আমি পুরাই হা! কাকে দেখলাম আমি এটা। আগা গোড়া পুরা কালো বোরখায় ঢাকা একটা মেয়ে! যার নখে অলওয়েজ নেইল পলিশ মাস্ট থাকতোই, তার এখন নখ বলতে গেলে দেখাই যায় না। কেটে এতোটাই ছোট করে রাখছে। ও আসবে, তাই কন্ট এক্সাইটেড ছিলাম। কিন্তু ওকে দেখে আর কোনো কথা বলতেই ইচ্ছা হচ্ছিলো না। তখন থেকেই আমাদের দূরত্ব বাড়ে। তপুর কথা বলসিলাম একবার ওকে। বলে, 'এসব করিস নাহ! গুনাহ্ হয়'। একজন মানুষকে ভালোবাসলেও গুনাহ্! এটা আবার কেমন কথা।

জানিনা কেনো যেন তাহমিনা আপুর সাথে কথা বলতে খুউব ইচ্ছা করছে। রাগ করে তো কল ব্লক করে রাখসি। আচ্ছা দেখি ফেসবুকে রিপ্লাই দেয় কিনা। দিবে না মনে হয়।”

ফেসবুক খুলে করে তাহমিনা আপুকে একটা মেসেজ দিল ইন্তিহা। কি লিখবে তা ভেবে পাচ্ছিলো না। তাই শুধু ”

দিয়ে সেন্ড করে দিলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রিপ্লাই।

“কিরে মন খারাপ, নাকি?” মেসেঞ্জারে, তাহমিনা আপু। ইন্তিহা খুব অবাক হলো। আপু বুঝলো কি করে! যাক, তাও এতদিন পর হঠাৎ নক দিয়ে মন খারাপের কথা বলতে

কেমন সংকোচ হচ্ছিলো ইস্তিহার। তাই স্বাভাবিকভাবেই বললো,” নাহ! কেমন
আছে?”

– আলহামদুলিল্লাহ্।

তুই?

– ভালোহ্।

আর কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না ইস্তিহা। আবার মনে মনে কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে।

এই না আবার ইসলাম নিয়ে কথা শুরু করে দেয় আপু।

– মামা মামি ভালো আছেন?

– সবাই ভালো আছে।

– তোর পড়াশোনা কেমন চলছে?

– ভালহ্।

– বাসায় থাকবি কালকে? ফ্রি ছিলাম। যাবো ভাবছিলাম তোদের বাসায়।

– এসো।

– তোর তপুর খবর কি?

– ভালোহ্।

– সেদিন কবে যেনো দেখলাম কাকে নিয়ে বাইকে করে যাচ্ছে।

– আমাদের ব্রেকাপ হয়ে গেছে আপু। বাদ দাও ওর কথা।

– মামির মাজার ব্যথা কমছে?

অফলাইন।



“আজকে তাহমিনা আপু এসছিলো। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত। এতোদিন তো তাও কান্না করতে পারছিলাম। যখনই কষ্ট লাগতো ইচ্ছা মত কেঁদে নিতাম। কিন্তু আপুর সাথে কথা হওয়ার পর মনে হচ্ছে যেন কষ্টগুলো সব বুকের ভেতর জমাট বেধে গেছে। একটুও কাঁদতে পারছি না। বার বার আপুর কোয়েস্চনগুলো কানে ভাসে। কিছু ডায়রিতে তুলে রাখি হয়ত ফিউচারে আমারই কাজে লাগবে।

- ১) তোর বেঁচে থাকা উদ্দেশ্য কি? তপুর মত একটা ছ্যাচড়া ছেলেকে বিয়ে করা?
- ২) এই জন্যই কি এত বছর থেকে মামা মামি এত কষ্ট করে তোকে বড় করেছে?
- ৩) এই জন্যই কি আল্লাহ্ তোকে সৃষ্টি করেছেন?

এখন আর আমার কান্না পায় না। বার বার চোখ ভিজে আসে। আবার কথাগুলো মনে পড়ে। মুহূর্তেই চোখে খরা “

ইন্তিহা এক দৃষ্টিতে দেয়ালে আঁকা প্রজাপতিটার দিকে তাকিয়ে আছে। তার মাথার ভেতর এখন রাজ্যের ভাবনা ঘুরছে। সত্যিই তো! আল্লাহ্ কেন তাকে সৃষ্টি করেছেন, জীবন দিয়েছেন। আল্লাহ্ নাকি কোনো প্রয়োজন ছাড়া কিছু করেন না, তাহলে ইন্তিহার বেঁচে থাকার কি প্রয়োজন আছে! হ্যাঁ! প্রয়োজন তো আছেই হয়ত। তা না হলে এতবার সুইসাইড করতে ট্রাই করেও কেন পারলো না সে। আবার সামনে মিড! পড়তে হবে। কোনোভাবেই মিডে খারাপ করা যাবে না। তা না হলে সবাই ভাববে তপুর জন্য এমন হয়েছে।

এসব ভাবতে ভাবতে ইন্তিহা পড়তে বসলো। প্রায় মাস খানেক পর পড়তে বসেছে ও। কিন্তু পড়তে বসেই আবার মনটা খারাপ হয়ে গেলো। আগে তো পড়তে বসলেই তপুকে একটা এসএমএস দিয়ে দিতো। এখন আর তা হবে না। পরক্ষণেই তাহমিনা আপুর একটা কথা মনে পরে যায়। আপু বলেছিলো খুউব বেশি মন খারাপ হলে

নামাজ পড়ে সেজদায় গিয়ে আল্লাহ্ এর সাথে কথ বলতে। এতে নাকি মন হালকা হয়। কিন্তু এত বছর পর নামাজ পড়তে কেমন যেন সংশয় হচ্ছিলো ইত্তিহার। তাও আবার নিজের কষ্টের কথা বলতে সে নামাজে দাঁড়াবে। অদ্ভুত! এত বছর কোনো কষ্ট ছিলো নাহ। নামাজও পড়ে নি। কি ভাববে আল্লাহ্! ভাবতে ভাবতেই কানে হেডফোন লাগিয়ে গান প্লে করে দিলো ইত্তিহা। সামনে বই। কানে হেডফোন। হাতে ফেসবুক। গান প্লে হচ্ছে।

“তুমি যাকে ভালোবাসো স্নানের ঘরে ভাসবে ভাসো।

তার জীবনে ঝড় তুমি অন্য কারো সঙ্গে বেধো ঘর।”

অজান্তেই ইত্তিহার গাল বেয়ে দু’ফোটা পানি গড়িয়ে গেলো। গানের “তুমি অন্য কারো সঙ্গে বেধো ঘর” সেনটেন্সটা কিছুতেই মনে নিতে পারছেননা ও। হেডফোন খুলে দূরে ছুড়ে ফেললো। আর সাথে সাথে ফোনের সব গান ডিলিট করে দিলো। সবগুলো ফালতু গান! তারপর ওয়ু করে নামাজে দাড়ালো। যদিও বার বারই মনে হচ্ছিলো যে আল্লাহ্ কি ভাববে। কতটা স্বার্থপর সে। আর এতো বছর নামাজ না পড়ায় অনেক কিছুই ভুলে গিয়েছিলো। তবুও যেটুকুই মনে আছে তা দিয়েই নামাজটা পড়ে নিলো।



এক সপ্তাহ মিড দিয়ে এখন একটু ফ্রি হলো ইত্তিহা। তাহমিনা আপুর সাথে অনেক কথা হয় এখন। দুজন আবার আগের মত ফ্রেন্ড হয়ে গেছে। নামাজ পড়া, কোরআন পড়া, পর্দা করা সব ধরনের ভালো কাজেই আপু ওকে প্রচুর ইন্সপাইয়ার করে।

নামাজটা কন্টিনিউ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে ইত্তিহা। ফজর আর জোহরের নামাজটা পড়তে খুব বেশি কষ্ট হয় ওর। আর কোরআন পড়া তো ভুলেই গেছে। লাস্ট কবে যে কোরআন হাতে নিয়েছিলো, তাও মনে নেই। পর্দা করার ব্যাপারটা এখনো মন থেকে

মেনে নিতে পারছে না ইত্তিহা। কেন এত গরমের মধ্যেও এত কালো একটা বস্তু গায়ে দিয়ে রাখতে হবে। কেন শুধু মেয়েদেরকেই পর্দা করতে হবে। এ ধরনের হাবিজাবি অনেক কোয়েন্সেন মাথে আসে ওর। তবু তাহমিনা আপু পর্দার ব্যপারে কিছু বললে ইত্তিহা জবাব দেয়, “হুম করবো ইনশাআল্লাহ্!”

কফির মগটা হাতে নিয়ে, বারান্দায় এলোভেরা টবের পাশে বসলো ইত্তিহা। এলোভেরা টবটা তপু সহ কিনেছিলো, আই হাসপিটালের সামনে থেকে। ভারি টবটা হাতে নিয়ে হাটতে তপুর খুব কষ্ট হচ্ছিলো। একটাও রিকশা পাওয়া যাচ্ছিলো না। সব স্মৃতির খুটিনাটি সব কিছুই মনে আছে ইত্তিহার। কি মনে করে যেন ও উঠে গিয়ে আবার টবের পাশে এসে বসলো। বারান্দার ফ্লোরে এলোভেরা টবটার পাশে বসে ইত্তিহা ডায়রি লেখা শুরু করলো।

“তপু আসলে খুব একটা খারাপ ছেলে নাহ্। এখন শয়তানের ধোঁকায় পরে হয়ত এসব করে বেরাচ্ছে। আমি আল্লাহ্ এর কাছে দো’আ করি আল্লাহ্ যেন ওকে হেদায়াত দেন। সেই সাথে আলহামদুলিল্লাহ্! তপু আমার সাথে চিট না করলে হয়ত আমি কখনোই আমার রবকে চিনতে পারতাম না। আলহামদুলিল্লাহ্, আমার রব আমাকে পথ দেখিয়েছেন, অনেকবার সুইসাইড করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি।

আলহামদুলিল্লাহ্। এটা আল্লাহুই ইচ্ছা।

এখন আর সুইসাইড করার কথা ভুল করেও ভাবতে পারি নাহ্ আমি। এত কষ্ট, এত ধৈর্যের রেজাল্ট এক সেকেন্ডে শেষ করে দেয়ার কোনো ইচ্ছা বা সাহস কিছুই নাই আমার। এমনিতে আমরা অনেক ছোট বড় গুনাহ্ করে ফেলি। আল্লাহ্ চাইলে সব মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু যারা সুইসাইড করে তাদের আল্লাহ্ কখনো ক্ষমা করেন না। তাহলে কেন, কার জন্য আমি আমার সারাজীবনের ছোট বড় সব ভালো

কাজগুলা এক মুহূর্তে শেষ করে দিবো? তপুর জন্য? যে এই সাময়িক পৃথিবীতেই আমাকে এত কষ্ট দিলো, তার জন্য আমি আমার আলটিমেট লাইফ কেন শেষ করবো! মাত্র অল্প ক’দিনে মনে হচ্ছে আমার বয়সটা অনেক বেড়ে গেছে। অনেক কিছু বুঝতে পারছি আমি। আসলে, আল্লাহ্ সব সময়ই মানুষকে পথ দেখায়। কিন্তু সে তা মানবে নাকি মানবে না সেটা তার নিজের ডিসিশন। লাইক, তপুর সাথে রিলেশন শুরু করার আগে কিন্তু আমি জানতাম যে এটা হারাম। কিন্তু মানি নাই। আমার সামনে দুইটা পথই ছিলো। হয়, এটা হারাম তা মেনে নিয়ে আল্লাহ্ কে ভয় করে রিলেশনে না জড়ানো। নাহয়, না মেনে নিয়ে আল্লাহ্ এর পরোয়া না করে রিলেশনে জড়ানো। যদি মেনে নিতাম তাহলে তো, লাস্ট দুইটা বছর ওর জন্য যে কষ্টগুলা আমি পাইছি তা আমার জীবনে আসতো না। আর কেউ হয়ত আমাকে মেন্টাল পেশান্ট ভেবে সাইকোলজিস্ট দেখাতেও সাজেস্ট করতো না। ডিসিশনটা আমার ছিলো আর এর রেজাল্টও বুঝতে পারছি।

এখন শুধু বার বার মনে হয়, ইশ! তখন যদি আল্লাহ্কে ভয় করে কোনো হারাম সম্পর্কে না জড়াতাম! কিন্তু যা হয়ে গেছে তার জন্য আল্লাহ্ এর কাছে ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। সেদিন কথার ফাঁকে, কি বলতে বলতে যেন দীপ্তি বলে উঠলো, “তপু তোর সাথে এমন করেছে! আল্লাহ্ বিচার করবে ওর! কু* একটা!” কথটা শুনে হঠাৎ খুউব ভয় পেলাম আমি। মনে হলো আল্লাহ্ তো ন্যায়বিচারক! রিলেশন করাতে যদি আল্লাহ্ ওর বিচার করেন তাহলে তো আমারও বিচার হবে। ও আমাকে প্রোপজ করেছে আর আমি এক্সেপ্ট করছি। তাহলে গুনাহ্ তো আমারও হইসে। এইসব ভেবে দীপ্তিকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, “আচ্ছা বাদ দে! আল্লাহ্ ওকেও

মাফ করে দিক আর আমাকেও।” একথা শুনে দীপ্তি টিটকারী দিয়ে বললো, “হায়রেহ্ ভালোবাসা!”

আমি চুপ ছিলাম। কারণ, তখন দীপ্তিকে বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না; যে তপুকে ভালোবাসি বলে আমি এই কথা বলিনি। বরং আল্লাহ্ কে ভয় করি বলেই, বলেছি। আর দো’আ করি আল্লাহ্ যেন আমাদের দুজন কেই ক্ষমা করে দেন। ল্যাব মিডের শেষে তপুর সাথে দেখা হয়েছিলো। ও হয়ত অপরাধবোধে ভুগছে। মাথা নীচু করে ৫ বছরের বাচ্চাদের মত সরি বললো। দেখে এত মায়া লাগসিলো আমার। কিন্তু আমি অন্য দিকে তাকিয়ে বললাম, “তপু, নামাজ পড়ে আল্লাহ্ কে সরি বলো। আর দো’আ করো আল্লাহ্ যেন আমাদের দুজনকেই ক্ষমা করে দেন।” এটুকু বলেই আমি চলে এসেছি। ওর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করি নি। কোনো ভাবে যদি আমরা আবার শয়তানের ধোঁকায় পরে যাই! শয়তান হয়ত এখন আর আমাকে ধোঁকা দিতে পারছে না, তাই ওর মনে অপরাধবোধ দেখাচ্ছে।

এখন বার বার মনে হয়, ইশ! কেন যে আগে তাহমিনা আপুর কথা শুনি নাই। আল্লাহ্ তো আমার কাছে আগেই তাহমিনা আপুকে পাঠিয়েছিলো। আমিই মানি নাই। কি আশ্চর্য তাই নাই! একজন মুসলিম মেয়ে হয়েও এই ২০ বছর বয়সে এসে আমি ইসলাম নতুন করে শিখছি। আমি কোরআন পড়া ভুলে গেসি। একটা লেটারও চিনি না।” কুলহ্ আল্লাহ্ ” কে এই ১৫ টা বছর “কুঙ্খু আল্লাহ্” পড়ে এসছি। কারো কোনো মাথা ব্যথা নাই। অথচ কোন ক্লাসে যেন আওয়ার(Hour) কে হাওয়ার বলেছিলাম। আম্মু কি বকা টা যে দিসিলো। ‘আওয়ার’ উচ্চারণ জীবনে আর ভুলিনি। আম্মুকে বলেছিলাম, যে আমি কোরআন পড়া আবার শিখতে চাই। কিন্তু আর হয় নাই। “এই বয়সে তুমি হুজুরের কাছে আলিফ বা শিখবে! কি বলবে সবাই” এইসব

হাবিজাবি কথা। আম্মুকে কোনোভাবেই বুঝাতে পারলাম না যে কে কি বলবে আর থেকে আমার কোরআন পড়া শিখাটা বেশি ইম্পরট্যান্ট। তারপর তাহমিনা আপুর থেকে কোরআনের অনুবাদটা এনে পড়া শুরু করেছি। আরবি পারিনা তাতে কি হয়েছে! বাংলা তো পারি। একদিন আরবিও পারবো ইনশাআল্লাহ্। গতরাতে সুরা ফাতেহার অর্থ পড়লাম। এতো বছর এই সুরা নামাজে কত বার পরেছি। অথচ অর্থ কালকে জানলাম। এত সুন্দর অর্থগুলো। আজকে সকালে সুরা বাক্বারাহ্ এর অর্থ পড়লাম। শেষ হয়নাই এখনো। তাও কিছু কিছু আয়াতের অর্থ পড়ে মনে হয়েছে, কথা গুলো যেন আল্লাহ্ নিজে আমাকেই বলছেন। আর বার বার চোখ ভিজে আসছিলো। আর মনে মনে ঠিক করে নিলাম, যত যাই হোক জীবনে আর কখনোই আল্লাহ্ এর অবাধ্য হবো নাহ্। ইনশাআল্লাহ্।”



মিডের পর এই প্রথম ক্লাসে এসেছে ইত্তিহা। প্রায় দুই সপ্তাহ ক্লাসে আসেনি ও। কেমন যেন দ্বিধা দ্বন্দ্ব হচ্ছিলো ওর। আর বার বার মনে হচ্ছিলো সবাই কি ভাববে, “এন্ত ট্রেন্ডি একটা মেয়ে হঠাৎ এমন হয়ে গেলো কেন!” মনে মনে যে ভয়টা পাচ্ছিলো ঠিক তাইই হল; ইত্তিহাকে দেখেই দীপ্তি, অনন্যা, রেদোয়ান সেই লেভেলের পঁচানি দিলো। অনন্যা তো বলেই বসলো, “কিরে বিরহে তো চিৎ হয়ে গেলি দেখি। কোনো সাজ নাই। ইইয়া বড় ওড়না দিয়ে চুল ঢেকে এসছিস। নাকি প্রেমের শোকে চুল বিসর্জন দিলি!”

অন্য কোনো সময় হলে হয়ত মুখ ঠাসা কোনো উত্তর দিয়ে দিতো ইত্তিহা। কিন্তু আজ সে পুরো চুপ ছিলো। কারণ সে জানে এখন ধৈর্য ধরা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। হাজার বলেও এখন কাউকেই এটা বুঝানো সম্ভব না যে, ঠিক কি কারণে সে একটু

একটু করে পর্দা করার চেষ্টা করছে। পঁচানির এক পর্যায়ে দীপ্তি বললো, “ইত্তিহা, আজ তোর ক্রাশ আসবে। তাহসান। অডিটোরিয়ামে কন্সার্ট। সবাই যাবো ফাস্ট গ্যাপে।”

রেদোয়ান বললো, “তুই তো আবার হুজুর হয়ে গেছিস। কন্সার্টে তো যাবি নাহ্, তাই না?” এ কথায় একটা হাসির রোল পরে গেলো। ও সত্যিই যাবে না। কিন্তু এ কথা এখন এখানে বলার কোনো মানেই নেই। ফাস্ট গ্যাপে সবাই কন্সার্টে চলে গেলো।

ইত্তিহা কিছুক্ষন ক্যান্টিনে বসে আগের পড়াগুলো পড়ে নিলো। তারপর আর তার একা বসে থাকতে ভালো লাগছিলো না। তাই হাটতে হাটতে রবীন্দ্রসরবরে গিয়ে বসলো।

দুপুর বেলা বলে হয়ত অনেক ফাঁকা ফাঁকা লাগছে যায়গাটা। সন্ধ্যা হলে তো কপত কপতীর বিচরণ ক্ষেত্রে পরিনত হয় এটা। কণ্ঠ স্মৃতি ভরা একটা জায়গা। বড় বট গাছটার নীচে বসে তপুর সাথে কত গল্প করত। এখনো সেই একই জায়গায় বসেছে ও। কিছুদিন আগেও বড় বট গাছের নীচটা ইত্তিহার ফেভারিট জায়গা ছিলো। কিন্তু আজ এখানেও বোরিং লাগছে। অযথা মনটা খারাপ হয়ে আছে। কিছু একটা লিখবে ভেবে ব্যাগ থেকে নীল মলাটের ডায়েরিটা বের করলো ইত্তিহা। নাহ্! লিখতেও হচ্ছে হচ্ছে না। তাই পেছনের পাতাগগুলো উলটে দেখছিলো। কত কথা লেখা আছে এই ডায়েরিতে। মাঝে একটা পেজে, একটা প্রান হজম ক্যান্ডির খোশা স্ট্যাপল করে লাগানো। আর নীচে লেখা, “উনি দিয়েছেন

আম্মুর সাথে রাগ করে কতো কি লিখে রেখেছে এখানে। দীপ্তিকে নিয়ে লেখা, “দীপ্তি একটা ঢঙ্গী।” তাহমিনা আপুকে নিয়ে প্রায় দুই বছর আগে লিখেছিলো, “তাহমিনা আপুটা দিন দিন ক্ষ্যাত হয়ে যাচ্ছে” পড়তে পড়তে চোখ জ্বালা করছে ইত্তিহার।

মনে হচ্ছে যেন নিজের জীবনের টাইমলাইন নিজেই দেখছে। মাত্র এক মাস আগের ইত্তিহা আর আজকের ইত্তিহা একই মানুষ না। সেই হাত, পা, শরীর, চেহারা, চোখ

সব একই আছে; কিন্তু কোথাও যেন কি একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয়ে গেছে। টুইংটুং!!!
ফোনে এসএমএস এসেছে। রেদোয়ানের এসএমএস, “কিরে কি হইসে তোর!
কন্সার্টেও আসলিনা। ক্লাস তো শুরু হয়ে গেছে। ক্লাসেও আসবি না, নাকি!”
উঠে দাড়ালো ইন্তিহা। খুব শান্ত মেয়ের মত হাটছে, ক্লাসের উদ্দেশ্যে। ওকে বাইরে
থেকে দেখে ভেতরের ঝড় বোঝার উপায় নেই। আর নীল মলাটের ডায়রিটা, রবীন্দ্র
সরবরের সেই বড় বট গাছের নীচেই রয়ে গেলো। এখন আর ওটার কোনো প্রয়োজন
নাই ইন্তিহার।

মন খারাপ হলে, কারো উপর রাগ হলে, মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে খুব একা
একা লাগলে, অনেক সুন্দর বৃষ্টি হলে বা কোনো বিকাল আর সন্ধ্যার মাঝামাঝি সময়
কোনো হলুদ পাখি চোখে পরলেও আর ডায়রি লিখবে না ইন্তিহা। কারণ, মনের সব
কথা বলার মত একজনকে এখন ও পেয়েছে। যে ওর মনের সব কথা খুব মনযোগ
দিয়ে শোনে। আর যার কাছে সব ধরনের প্রবলেমের বেস্ট সলুশনটাই আছে। কে যেন
ইন্তিহাকে বলেছিলো, মনের কথা ডায়রিতে লিখলে মন ভালো হয়ে যায়। সব ফালতুহ
কথা! দু’রাকাত তাহাজ্জত নামাজ পড়ে মনের কথা আল্লাহ্ কে বললে মন ভালো হয়ে
যায়। যে এটা কখনো করেনি; সে কখনোই বুঝবে না ফিলিংসটা।

রৌদ্রময়ী একটা দেয়াল, যেখানে এসে রৌদ্রময়ীরা নিজেদের কথাগুলো খোঁদাই করে দিয়ে যায়- আবেগে, আবদারে, অভিযোগে, শাসনে। মমতাময়ী মা, প্রিয়তমা স্ত্রী কিংবা আমাদের মতই এই সমাজের একজন হিসেবে তাঁরা যেন সাহিত্যের এক নকশীকাঁথা বুনেছে। দাম্পত্য খুঁটিনাটি, পরিবার, সমাজ থেকে শুরু করে আমাদের এই যান্ত্রিক আটপোরে জীবনের নানা অসঙ্গতি, মিথ্যে মোহ আর নাট্যকেপনা আবেগের উল্টো পিঠে তাঁরা আমাদের শুনিয়েছে অদ্ভুত কিছু জীবনের গল্প। অযত্নে আর অবহেলায় যে গল্পগুলো পড়েই ছিলো, সেগুলোকে তাঁরা তুলে এনেছে পরম যত্নে, মমতায়। হৃদয়ছোঁয়া সেসব জীবনের গল্প নিয়েই এই বই 'রৌদ্রময়ী'।



দ্রষ্টব্য
প্রকাশন